বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-সেপ্টেম্বর। সাল-২০২৫

ভারতীয় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে রামচন্দ্র

জাগো দশপ্রহরণধারিণী

নয়াদিল্লিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন-কে অভিনন্দন জানাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

চিনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশন বৈঠকের ফাঁকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিয়ানজিনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে একই গাড়িতে চেপে আসেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চিনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশন বৈঠকের ফাঁকে একত্রে তিন বিশ্বনেতা- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙ।

বঙ্গ
কমলবার্তা
সেপ্টেম্বর সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

পরশ তোমার সবখানে মা ৬
অনিকেত মহাপাত্র

ভারতীয় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে রামচন্দ্র ৯
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় মোদীর রণহুঙ্কার ১২
জয়ন্ত গুহ

উদয়ের পথে বাংলাঃ মোদীর পূজা উপহার ১৪
বিনয়ভূষণ দাশ

সেনাকে অপমান করলেন মুখ্যমন্ত্রী ১৬
স্বাতী সেনাপতি

ছবিতে খবর ১৮

তৃণমূলী হিন্দু সন্ত্রাস কি ক্ষমা করবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নমঃশূদ্ররা? ২৪
কুশল নস্কর

জাতীয় স্বার্থও জাতীয় মর্যাদার বিদেশনীতি ২৮
আবীর রায়গাঙ্গুলী

বেঙ্গল ফাইলসঃ সিনেমা রিভিউ ৩২
সৌভিক দত্ত

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

দেশপ্রেমে একসময় গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। একটা সময় তো বলাই হত, আজ যা বাংলা ভাবে আগামীকাল তা গোটা দেশ ভাবে। ১৯৬০ সাল। মহারাষ্ট্র তখন তৃতীয় আর বাংলা তখন অর্থনীতিতে সবচেয়ে ধনী রাজ্য। বাংলা তখন গোটা দেশকে ভাবতে শেখায়। সেই বাংলায় মানুষ এখন স্বাধীন ভাবে ভাবতে ভয় পায়। স্বাধীন ভারতে বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে তৃণমূল নামে ভুঁইফোড় এক রহস্যময় প্রজাতি। প্রজাতি না মারণ ভাইরাস। বলা মুশকিল। তবে চরিত্র তাদের হিন্দু বিরোধী। অদ্ভুত! হিন্দু হোমল্যান্ডেই হিন্দু বিরোধী চরিত্র। এই প্রজাতি বা ভাইরাস, ধরা যাক 'ভাইরাস এম' নিঃসন্দেহে বাংলা বিরোধী-বাঙালী বিরোধী এবং দেশ বিরোধী। এই খেয়েছে। কি অদ্ভুত! বিপ্লবী বিস্ময়-বালক কমরেড ব্রাত্য তার নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'ভাইরাস এম'! কার কথা ভেবে! বেশ সন্দেহজনক। মহাকাব্য কথাঞ্জলি-র মহাকবি-মহা দার্শনিক-মহামানবী ('ম' পড়বেন 'দ' নয়) এবং মহামহামহা নেত্রী···কি নামটা যেন! ধুসস নাম তো সাধারণ মানুষের থাকে। উনি তো ভিনগ্রহ থেকে আসা এক জীবন্ত শিলালিপি যাকে দেখলে নাকি ২০০ জন ভারতীয় সেনা পালিয়ে যায়!

ভাবনায় 'ম্যাও'বাদের কাছাকাছি এই আরবান নকশালরা, নকশাল নাকি খ্যাকশেয়াল? ধরা যাক খ্যাকশেয়াল। তো এরা ক্ষণে ক্ষণে খ্যাক খ্যাক করে তাদের অবোধ ও অর্বাচীন ভাষণে প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয় এই বাংলায় তাঁরা এবং তাদের ভাবনা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অনাগত এবং অবাঞ্ছিতও বটে। তাদের নির্বোধ হম্বিতম্বিতে বাংলা চুপ করে আছে মানে মেনে নিচ্ছে তা নয়। বরং নীরবে হাসতে হাসতে বিভোর কীর্তনে, গরানহাটার রাজকুমার আর পদিপিসির আস্ফালনকে ছুঁড়ে ফেলছে যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সেখানে গেলে মানুষ বিকেলে ভোরের 'ষোড়শী' নয়, সর্ষে ফুল দ্যাখে। সময় তো আসন্ন। খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলকেও চলে যেতে হবে। যেতে হবেই।

'যাব কিন্তু কেন যাব···' এ প্রশ্ন তোলারও কি নৈতিক অবস্থানে আছে বিপ্লবী বিস্ময় বালক কমরেড ব্রাত্য ও পোবোল পোতাপশালী মহামহামহা নেত্রী-র রহস্যময় অদ্ভুদ প্রজাতি তিনোমূল? বিধানসভাতে প্রমাণিত যে ওরা হাদা-ভোঁদার দল। অসমসাহসী কমরেড ভোঁদার সেই অনির্বচনীয় নাটকের সংলাপ- "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন, যেখানে আমাদের ভাষা আন্দোলন, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চ সেনাবাহিনী ভেঙে দিল। ভেঙে প্রায় ছাউনি সেখান থেকে তুলে দিল·····তখন আমার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কথা মনে পড়ছিল স্যর···" বোঝো কাণ্ড! ১৯৭১-এ যদ্দূর সম্ভব কমরেড ভোঁদার বয়স ছিল ৩। এবং এখনও সংযত না হলে এই রাজ্যেই এমন অবস্থা হতে পারে যাতে দুহাতে প্রাণপণে হাফ প্যান্ট ধরে রাখতে হবে। সাবধান কমরেড ভোঁদা।

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

অটল বিহারী বাজপেয়ী ও বিল ক্লিনটন।

"দাদাগিরি এবং হুমকি দেওয়ার স্বভাব আমেরিকার আজকের নয়। বরাবরের। পরিস্থিতি ভিন্ন কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর মত অটল বিহারী বাজপেয়ীকেও সহ্য করতে হয়েছে আমেরিকার অযথা চাপ ও হুমকি। ভারত যখন দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফারণ ঘটায় ১৯৯৮ সালে, তখনও আমেরিকা ভারতের ওপরে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ঘোষণা করেছিল। ভারতের পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কূটনীতিক টিপি শ্রীনিবাসন এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, "ক্লিনটন ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে রীতিমতো হুমকির সুরে এক বার্তা পাঠিয়েছিলেন : "আমি বার্লিন যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছতে আমার ছয় ঘন্টা লাগবে। যদি ততক্ষণে ভারত সরকার বিনা শর্তে সিটিবিটি (কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি)-তে সই না করে তাহলে আমি বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব।" প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দফতর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নরেশ চন্দ্রকে জানানো হয় যাতে তিনি পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া না দেন, যতক্ষণে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের বাকি অংশের কাজ শেষ না করা হচ্ছে। এরপর ১৩ মে সরকার ঘোষণা করল যে এখন থেকে আর কোনও পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফারণ ঘটানো হবে না এবং সিটিবিটি-এত সই করতে সরকার রাজি। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না! কিন্তু ততক্ষণে যা করার করে ফেলেছে বাজপেয়ী সরকার।"

জর্জ বুশ ও অটল বিহারী বাজপেয়ী।

“প্রবল মার্কিন চাপের মুখে দাঁড়িয়েও নীতিতে অনড় ছিলেন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর স্নেহধন্য শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে আজ যেমন ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তেমনি ২০০৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাক আক্রমণ করেছিল। সন্দেহ ছিল ইরাকে নাকি গণবিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডার আছে এবং তা থেকে আমেরিকাকে বাঁচাতে ইরাক আক্রমণ।

প্রধানমন্ত্রী তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রথম থেকেই ইরাক আক্রমণকে তিনি সমর্থন করেননি। নিন্দা প্রস্তাবও আনা হয় ভারতীয় সংসদে। এরপর আমেরিকা ভারতকে অনুররোধ করে যুদ্ধের পর পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে যে বাহিনী যাবে ইরাকে, তার মধ্যে যেন যে ভারতও তাদের সেনা পাঠায়। আসলে আমেরিকা চাইছিল যে ভারত আর পাকিস্তান দুই দেশই ওই 'শান্তি সেনাবাহিনী'তে নিজেদের সৈন্য পাঠাক। বৈঠকের পর বৈঠক চললেও শেষমেশ কিন্তু বাজপেয়ী সরকার সেনা পাঠায়নি ইরাকে। প্রথমে তিনি আমেরিকাকে যুক্তি দিলেন, “আমার হাত-পা বাঁধা।”

বছরের শেষে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে ইরাকে কোনও গণবিধ্বংসী অস্ত্র নেই, তখন বাজপেয়ী প্রথমবার জনসমক্ষে বলেন, "আমরা চাই নি যে আমাদের সেনাসদস্যরা একটি বন্ধু দেশে গিয়ে গুলির নিশানা হয়ে উঠুক।" যশবন্ত সিনহা তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন, "আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করতে চান নি বাজপেয়ী, এমনটা নয়। কিন্তু তিনি এটা কিছুতেই চাইতেন না যে আমেরিকার প্রতিটা কথাই ভারত মেনে নিক। তার কাছে সম্পর্ক হবে সমানে-সমানে, পারস্পরিকভাবে এবং একে অপরকে সম্মান করবে।" আমেরিকা প্রসঙ্গে সেদিনই বাজপেয়ী আসলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বন্ধুত্ব থাকলেও ভারতের বিদেশ-নীতি হবে স্বাধীন। বন্ধুত্ব মানে মাথা নোয়ানো নয়।”

পরশ তোমার সবখানে মা

কাশ্মীর থেকে বঙ্গদেশ

অনিকেত মহাপাত্র

দেশকে আমরা মা হিসেবে পূজা করি। তাঁর মূর্তিও তো সেই মা দুর্গা-প্রতিম। তাঁর রাষ্ট্রীয় স্তুতি অর্থাৎ বন্দে মাতরম গান তো সেই মা দুর্গার-ই স্তুতি। লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে তিনি 'দশপ্রহরণধারিণী'। এই মহতী ক্ষণে তাঁর কাছে সমস্ত ভারতীয়র প্রার্থনা ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার বিরল ক্ষেত্র বঙ্গদেশের ওপর চেপে থাকা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বিজাতীয় বোঝার মুক্তি ঘটুক।

মা, আসছেন! মা মেনকার মতো আকুলি বিকুলি করে ওঠে মন। মা, আসছে–ছোটো-বড়ো সবার মা! কাশ ফুটছে, বাতাসে শিউলির গন্ধ, চলছে কেনাকাটা। কারণ পুজো, পুজো, পুজো! বাঙালির প্রাণের উৎসব! সারাবছর তার জন্যই তো প্রতীক্ষা চলে! মা দুর্গা গজে অর্থাৎ হাতির পিঠে করে মর্ত্যে আসছেন। দেবীর গজে আগমনকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়, যা শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। মায়ের এই আগমন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাঙালির জন্য বৃহত্তর শুভ কিছু বয়ে আনবেই।

দেবীর আরাধনার প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভারতে শুরু হয়েছিল গত মে মাস থেকে। দেবী শুধু তিথি-ক্ষণ দেখে আসেন না। আসেন যখনই অন্যায় সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ প্রতিকার খোঁজে। তখনই দেবী আসেন। বিভিন্ন রূপে। কাশ্মীরের পেহেলগাঁও-এ যেভাবে বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল হিন্দুদের পরিচয় জেনে জেনে। তার প্রতিকারে দেবী দুর্গা তিথি-নক্ষত্রের বিষয়টি উহ্য রেখে জেগেছেন। সিঁদুর রাঙা সেই প্রতিকার ভয়ংকর। যা আজও বহমান।

বাঙালির প্রাণের মানুষ, স্বামী বিবেকানন্দ এই কাশ্মীরে ১৮৯৮ সালে জনৈকা কাশ্মিরী মুসলিম কন্যাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করেন। আবার ১৯০১ সালে স্বামীজীর দ্বারা বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় মা সারদার উপস্থিতিতে নয় জন কুমারী কন্যা পূজিতা হন। সেই বেলুড়মঠে কুমারী পূজার সূত্রপাত। অন্য কোনও কোনও পারিবারিক পূজায় এই প্রথা পালিত হলেও, ব্যাপকভাবে কুমারী পূজার সূত্রপাত বেলুড়মঠের অনুসরণে। ফলে আজকের বাঙালির দুর্গাপূজার এই বিশেষ রীতির সূত্র-বীজ নিহিত রয়েছে কাশ্মীরে।

কাশ্মীরও তন্ত্রভূমি বাংলার মতো। কাশ্মিরী শৈবতন্ত্র আর বঙ্গীয় শাক্ততন্ত্র যেন এক পূর্ণ অধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ শাক্তক্ষেত্রগুলি বঙ্গদেশের তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে যে অন্ধকার যুগ চলছিল তার মধ্যে

আলোকবর্তিকার কাজ করেছিল। বাঙালি যে পারসিকদের মতো একেবারে উবে যায় নি তার কারণ এই মাতৃকাশক্তি। কেউ কেউ বলেন ষষ্ঠী থেকে শুরু করে বিজয়া অবধি মায়ের মুখের বিচিত্র পরিবর্তন হয়। কখনও তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জাবনতা, কখনও ক্রোধে আরক্ত তাঁর মুখমণ্ডল, কখনও আবার আরও ভীষণা, আবার কখনও আসন্ন বিচ্ছেদের অনুমানে কিয়ৎ ক্লিষ্ট! যেমন করে কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী মন্দিরের সঙ্গে লগ্ন জলভাগের রঙ বদলায়। ভারত-চিন যুদ্ধের সময় নাকি হালকা লাল হয়ে উঠেছিল। আবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় কালো। আর পেহেলগাঁও ঘটনার পর সেই জল হয়ে ওঠে সিঁদুরের মতো লাল। ক্ষীর ভবানী মন্দির হলো জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে তুল্লামুল্লা গ্রামে অবস্থিত একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির, যা দেবী দুর্গার অবতার রাগ্যা দেবীকে উৎসর্গীকৃত। এটি একটি পবিত্র ঝর্ণার উপরে নির্মিত এবং এর জল রং পরিবর্তন করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

আবার কাশ্মীর এবং বঙ্গদেশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ 'ফাইলস' সম্পর্কেও সম্পর্কিত। 'কাশ্মীর ফাইলস' এবং 'বেঙ্গল ফাইলস' নামের সিনেমা দুটি হারিয়ে ফেলা কিংবা বলা ভালো ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসকে খুঁজে আনার প্রয়াস। পরিচালক একই—বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী। আর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর যে প্রতিকার করেছিল হিন্দুসমাজ তাও সশস্ত্র ও শাক্তধারার।

তবে এই যোগ এবং বিয়োগ আর যোগাযোগের আলোচনার মাঝেও বাঙালির অর্থাৎ আমাদের নিজেদের বিষয়ে শঙ্কা হয়! দুর্গাপূজা এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে কতদিন, আর কতদিন?

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে রাত-পাহারা দিতে হয় ধর্মান্ধদের হাত থেকে প্রতিমা রক্ষা করার জন্য। ওই দেশের জনৈক উপদেষ্টা বলেই দিয়েছেন অর্থাৎ সতর্ক করে দিয়েছেন 'পূজা নামক মদ-গাঁজার আসরের' ব্যাপারে। একদা বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে পাকিস্তানে। পৃথিবীর চতুর্থ গতি-সূত্র অনুসারে যেখানেই ইসলাম ধর্মালম্বীদের থাকে বাস, সেখান থেকে ধীরে ধীরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওঠে বাস! এটি একেবারে সূত্র কিংবা সাধারণ ধর্ম। এর

ক্ষীরভবানী মন্দির ১৮৮০ সাল।

মা গুহ্যেশ্বরী শক্তিপীঠের মন্দির তোরণ।

ব্যতিক্রম হয়েছে বলে শোনা যায় না। স্পেনের প্রসঙ্গ আলাদা। কল্পনা করুন লাহোরে ১৯৪১ সাল নাগাদ দুর্গাপূজা হচ্ছে। বহু শিক্ষিত বাঙালি, কর্মসূত্রে যাঁরা লাহোরে থাকেন; মেতে উঠেছেন তাঁরা দুর্গা-বন্দনায়। সঙ্গী হয়েছেন সেই কাজে অন্যান্য হিন্দু ও শিখেরা। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যে জন-গণনা হয় তাতে লাহোরে হিন্দু ছিল ৩০%, শিখ ৫%, মুসলমান ৬৫.৫%, আর খ্রিস্টান সহ অন্যান্য সামান্য কিছু। লাহোরের মূল আর্থিক মেরুদণ্ড নির্ভরশীল ছিল হিন্দুদের ওপর। ফলে জাঁকজমক সহকারে পূজা হত, নবরাত্রি পালিত হত। আবার ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধ বা সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২৬-২৭%। এই প্রদেশের নগর পারকর-এ রয়েছে, চুড়িও জাবল দুর্গামাতা মন্দির। এখানেও ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হত। কিন্তু আজ? স্মৃতি আর স্মৃতিচারণ! স্মৃতিচারণ করবার মানুষও আজ অমিল। হিন্দুরা সেই যে হারাতে শুরু করেছিল নিজেদের সংখ্যা, ভূমি এবং অস্তিত্ব -- সব! এটি কোনও ইতিহাস নয়, এটি চলমান বাস্তবতা। নিউ আলিপুরের আর্মি ক্যাম্পের কাছে আছে পূর্ববঙ্গীয়দের অর্থাৎ হিন্দু বিতাড়নের ফলে চলে আসা মানুষদের একটি বসতি। সেখানে দেখি পালিত হয় অন্নপূর্ণাপূজা, বাসন্তীপূজা। দুর্গাপূজা তো হয়ই। তার পাশ দিয়ে গেলে পদ্মা পারের গন্ধ পাওয়া যায়। যেন এক টুকরো পূর্ববঙ্গ। সেই মানুষদের কেউ তেমন নেই, যাঁরা মনে করতে পারেন সুস্থ,স্বাভাবিক কোনও দুর্গাপূজার কথা। ছিল না কোনও ভয়, কিংবা সংকটের অস্তিত্ব। আর আজকের বাঙালি? যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আছেন তাঁরা কতদিন করতে পারবেন নিশ্চিন্তে তাঁদের প্রিয় আরাধনা? ইতোমধ্যে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার, উত্তর চব্বিশ পরগনার, মালদা জেলার বেশ কিছু অংশ আজ আর বাঙালির হাতে নেই। তা প্রকৃতপক্ষে আরব সাম্রাজ্যের অধীন। সেখানে মূর্তিপূজা 'সকত মানা' তা 'বুদ পরস্তি'। হিন্দু আক্রান্ত, হিন্দুর সংস্কৃতি আক্রান্ত! কাফের এবং কাফেরিয়ানা দুটোই মুসলিমদের কাছে সমান পরিত্যাজ্য। বাঙালিয়ানা মানেই আপনার প্রতিবেশীদের কাছে কাফেরিয়ানা। জনৈক সাবির আহমেদ-রা শুরু করেছিলেন 'প্রতিবেশীকে জানুন' নামের ক্যাম্পেন। তাঁরা যে প্রেরণায় কাজ শুরু করেছিলেন তা হল, নোবেল প্রাপক অমর্ত্য সেন-

এর' পরিচিতি ও হিংসা' নামক গ্রন্থের বিশেষ প্রতিপাদ্য -- অপরিচিতি থেকে হিংসার সূত্রপাত হয়।

এটি পৃথিবীর অন্যান্য প্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে যথার্থ হতে পারে কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী থাকলে বরং উল্টো ফল ফলতে বাধ্য। যদি সেই জানাটা বামপন্থার লাল চশমা দিয়ে না দেখা হয় কিংবা বিশেষ কোনও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিবাহী না হয় । বাঙালির আত্মঘাতী! না হলে কোনও এক বাঙালি নারী চলচ্চিত্র পরিচালক কীভাবে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাইকের সামনে বাস্তবতা ভুলে গিয়ে গাজা উপত্যকায় বিচরণ করতে থাকেন। আসলে 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' আর বাঙালি ভিন-প্রদেশে কিংবা প্রবাসে। নিজের মাটি নিয়ে তার কোনও মায়া নেই। নেই সংস্কৃতির প্রতি কোনও দায়। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত আলোকিত অংশ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতনামা বাঙালিদের একটি বড়ো অংশের জন্য এই কথাটি প্রযোজ্য।

আবারও তুলনামূলকতার সম্পর্ক এসে যায়, বাঙালির সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কাশ্মিরী পণ্ডিত এবং কেরলবাসী হিন্দুরা। কাশ্মিরী

বেলুড় মঠে মায়ের আরাধনা।

পণ্ডিতরা প্রায় সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সেই সম্প্রদায় এক সময় ভারতের সর্বস্তরে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আচার্য অভিনব গুপ্ত এই কাশ্মীরের অধিবাসী। কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাশ্মিরী পণ্ডিতদের অবদান অবিস্মরণীয়। বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন চলে আর সমানতালে চলে জন সংখ্যা বৃদ্ধি। পণ্ডিতেরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। আর সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমিও অচেনা হতে শুরু করে। মনে হয় পরবাস। সমানতালে হরি পর্বত হয়ে যায় 'কোহ-ই-মারান'। এই পশ্চিমবঙ্গেই দেখুন না কয়টি আউরঙাবাদ, আখলাখপুর তৈরি হয়েছে গত দুই দশকে। কলকাতার তো আবার আলিনগর হতে বেশি দেরি নেই। ১৯৪৬ -এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং যা পারেনি, সেই কাজ করে দিয়েছে,দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বাঙালির চেতনাহীনতা। কোথায় দুর্গাপূজা করবে বাঙালি আউরঙাবাদে নাকি আখলাখপুরে? নাকি ভবিষ্যতের অলিনগরে? কার্নিভাল নামক রঙ্গ-তামাশা কোথায় হবে? কে করবে আর দেখবেই বা কে? কলকাতার মেয়র যে মজহবি দাওয়াত দিয়েছেন তা কি এমনি এমনি? কোনও সংকেত পাচ্ছেন বাঙালি-সমাজ? কোথায় হবে পুজো? দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে ?

নিশাতা কাউল-রা সর্বত্র ছড়িয়ে যাঁরা কাশ্মীরের জিহাদিদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন। আবার রয়েছেন আদিত্যরাজ কাউল-রাও, যাঁরা কাশ্মিরী পণ্ডিতদের জন্য শুধু নয়, ভারত-ধর্মের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন অহরহ। কার পথে যাবে আত্মবিস্মৃত হিন্দু-সমাজ?

আজও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ করেন বামমার্গী শিক্ষক-প্রশাসক শিবির। তাঁরা কখনও কখনও জামা বদলান কিন্তু ভেতরের অন্তর্বাসগুলি কিন্তু বিদেশী লাল, যা তাঁদের শরীরের অংশ হয়ে গেছে প্রায়। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে একপ্রকার বিদ্বেষ ও ঘৃণা। এই ঘৃণা প্রকাশ করলে মেলে খ্যাতি, ফান্ড, বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় লেখার জন্য আহ্বান। এই ধারায় এবং ধারণায় যাঁরা আস্থাবান তাঁরা একটি সমাজের বোঝা বিশেষ। মা দুর্গা বাঙালির সেই বোঝা-মুক্তির আশীর্বাদ দিন। যেমন করে মুক্ত হল নেপাল কমিউনিস্ট শাসন নামের শিশুসুলভ অথচ দুর্নীতিপরায়ণ বিশৃঙ্খলা থেকে। একটি জাতির মেরুদণ্ড হল তার শিক্ষা। সেই শিক্ষা আলাদা করে দেয় 'জেন-জি দের পর্যন্ত। তাই বাংলাদেশের জেন-জি আর নেপালের জেন-জি আলাদা হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক ডি এন এ এভাবেই আলাদা করে দেয় দুটি দেশকে। কারণ সেখানে এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে রয়েছেন মা দুর্গা। দেবী গুহ্যেশ্বরী রূপে। কথিত আছে যে, পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত এই মন্দিরটিতে দেবী সতীর উভয় হাঁটু পড়েছিল, যা এই স্থানটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিপীঠে পরিণত করেছে। মন্দিরের দেবী গুহ্যকালী নামেও পরিচিত এবং এটি তান্ত্রিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

দেশকে আমরা মা হিসেবে পূজা করি। তাঁর মূর্তিও তো সেই মা দুর্গা-প্রতিম। তাঁর রাষ্ট্রীয় স্তুতি অর্থাৎ বন্দে মাতরম গান তো সেই মা দুর্গার-ই স্তুতি। লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে তিনি 'দশপ্রহরণধারিণী'। এই মহতী ক্ষণে তাঁর কাছে সমস্ত ভারতীয়র প্রার্থনা ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার বিরল ক্ষেত্র বঙ্গদেশের ওপর চেপে থাকা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বিজাতীয় বোঝার মুক্তি ঘটুক। বাঙালি আসুক নব গৌরবে তার মধ্যে থাকা চিরাচরিত জাতীয়তাবাদকে পাথেয় করে। ভারত দেশ তার শত্রুদের পূর্ণভাবে দমন করতে সক্ষম হোক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রণক্ষেত্রে। মা প্রকট হন বঙ্গের দুর্দশায় কিংবা ভারতের সংকটে। যেমন করে অশুভ শক্তির পারাভবের মানসে শ্রীরামচন্দ্র সূচনা করেছিলেন অকালবোধনের। বাঙালির সামনে সেই দৃষ্টান্ত-ই তো ধ্রুবতারা!

ভারতীয় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে রামচন্দ্র

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় নেই রামচন্দ্র! রবীন্দ্রনাথে রাম, নজরুলে রাম, গান্ধীজীতে রাম, রামকৃষ্ণে রাম, দুর্গা পূজায় রাম, দীপাবলীতে রাম, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় রাম, বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে রাম। কোথায় নেই রাম? এমনকি রাম-বিরোধী বাম নেতা ও ঐতিহাসিকেরও নাম সীতারাম ও রামচন্দ্র গুহ। তবু এতকিছুর পরেও যাঁদের মনে হয় যে রামচন্দ্র বঙ্গীয় সংস্কৃতির অংশ নয়- তাঁদের হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, নচেৎ তাঁরা জেনে বুঝে মিথ্যাচার করছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম হলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম। ফলে রামচন্দ্র অন্যতম হিন্দু দেবতাও। ভারতীয় ঐতিহ্যে মানুষের দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়া এবং দেবতার মনুষ্যরূপ ধারণ একটি সাধারণ ঘটনা। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অন্যতম রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র এই রামচন্দ্র। যে রামায়ণের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ভাষায় যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য কাব্য, নাটকসহ অগুন্তি সাহিত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার যেখানেই ঘটেছে সেখানেই শ্রীরামও পৌঁছে গেছেন। তাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াতেই রামচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়।

ভারতীয় সংবিধানের পাতায় শ্রী রামচন্দ্র, নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি।

ভারতীয় জনজীবনে রামচন্দ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "বাল্মীকির রামচরিত কথাকে কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। ···ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।" ভারতবর্ষের সবথেকে বড় উৎসব 'দীপাবলী'- যা রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরা উপলক্ষ্যে পালিত হয়। 'দশেরা' ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্যতম বড় উৎসব- যা কিনা রামচন্দ্রের লঙ্কাধিপতি রাবণকে পরাজিত করা উপলক্ষ্যে উদযাপিত হয়। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা থেকে অযোধ্যায় পৌঁছতে শ্রীরামচন্দ্রের সময় লেগেছিল ২১ দিন।

মজার কথা হল যে, আধুনিক প্রযুক্তিও বলছে শ্রীলঙ্কা থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যা পৌঁছতে কোন মানুষের প্রায় ২১ দিন লাগতে পারে। উত্তর ভারতের বহু মানুষ পরস্পরকে সম্বোধন করেন "রাম রাম" বলে। মৃত্যুর পর শোনা যায়- "রাম নাম সত্য হ্যায়।"

এইভাবে প্রত্যেক ভারতীয়-র জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছেন রামচন্দ্র। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদর্শ প্রজানুরঞ্জক, প্রজা কল্যাণকারী রাজ্য- যে রাজ্যে সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তাকে 'রামরাজ্য' বলা হয়ে থাকে। এই 'রামরাজ্য' স্থাপনের কথা গান্ধীজীও বলতেন। অনেকের মতে, গান্ধীজী মৃত্যুর আগের শেষ কথাও ছিল- "হে রাম।"

এবার আসা যাক আমাদের বঙ্গভূমির দিকে। বাঙ্গালীর সবথেকে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গা পূজা। আমরা সকলেই জানি শরৎ কালে মায়ের অকাল বোধন প্রথম করেছিলেন রামচন্দ্র- তার আগে মূলত পূজা হত বসন্ত কালে। এই অনুযায়ীই আজও বাঙ্গালী শরৎকালে মাতৃ আরাধনা করে চলেছে। বাঙ্গালী বাচ্চাদের আজও শেখান হয় ভূতের ভয় পেলে বলতে- "ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি/ রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?" হাওড়ার রামরাজাতলা, হুগলীর শ্রীরামপুরসহ গোটা বাংলা জুড়ে অসংখ্য স্থাননামের সঙ্গে (মূলত রামনগর, রামপুর ইত্যাদি) রামের সম্পর্ক রয়েছে।

এবার আমরা যদি বঙ্গের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে নজর দি তাহলে সেখানেও রামের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করব। বাংলায় রচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিত'। পাল বংশীয় রাজা রাম পালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। এই 'রামচরিত' কাব্য হল একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য- অর্থাৎ এখানে একই সঙ্গে তিনি রামচন্দ্রের কৃতিত্ব বর্ণনার আড়ালে পাল বংশীয় নৃপতি রাম পালের নানা কীর্তি-কাহিনির বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগে বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝা 'শ্রী রাম পাঁচালি' রচনা করেন- এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম হল- বীরভূমের লাভপুরের ফুল্লরা দেবীর মন্দির। সতীর অধর (নীচের ঠোঁট) এখানে

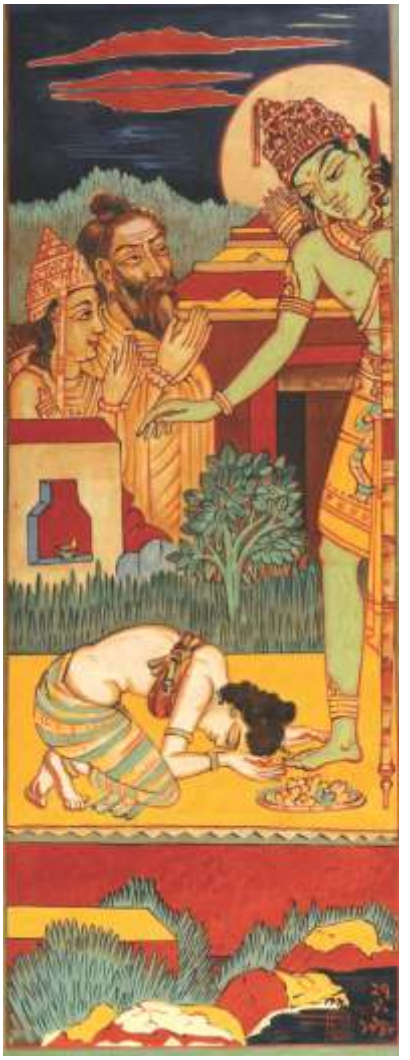

নন্দলাল বসুর আঁকা 'রামচন্দ্র ও অহল্যা।

আমরা সকলেই জানি শরৎ কালে মায়ের অকাল বোধন প্রথম করেছিলেন রামচন্দ্র- তার আগে মূলত পূজা হত বসন্ত কালে। এই অনুযায়ীই আজও বাঙ্গালী শরৎকালে মাতৃ আরাধনা করে চলেছে। বাঙ্গালী বাচ্চাদের আজও শেখান হয় ভূতের ভয় পেলে বলতে- ''ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি/ রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?''

পড়েছিল। বিশ্বাস যে, মন্দিরের পাশের বড় পুষ্করিণী থেকেই হনুমান রামচন্দ্রের জন্য ১০৮টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করেন- যা দেবী দুর্গার পূজার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবারের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্রীরাম। তাই পরিবারের তিন পুত্রের নামই শুরু হয় রাম দিয়ে- রামকুমার, রামেশ্বর এবং রামকৃষ্ণ। রাণী রাসমণি দেবীর পরিবারের কুলদেবতাও ছিলেন রঘুবীর- যা আদতে রঘু বংশীয় বীর রামচন্দ্রকেই বোঝাচ্ছে। সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন যে, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার আগে বাংলার মানুষ রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিত। কাজী নজরুল ইসলামের গান আছে রামচন্দ্রকে নিয়ে- "রসঘন রাম। নব দূর্বাদল শ্যাম।" বিশিষ্ট ক্ষেত্র সমীক্ষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ স্বপন কুমার ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন লেখায় বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বাংলার সঙ্গে রামের যোগাযোগ খুব প্রাচীন এবং গ্রাম বাংলার সঙ্গে এখনও রামচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারায় রামের অস্তিত্ব বিরাজমান। অন্যতম চৈতন্য জীবনীকার দয়ানন্দের নিজের পরিবার ছিল রামচন্দ্রের পরিবার। চৈতন্যদেবের বন্ধু মুরারী গুপ্ত নিজে ছিলেন রামভক্ত। রাঢ় বাংলার অন্যতম দেবতা হলেন ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজপালায় বহু জায়গায় রামায়ণের গান হয়। এছাড়াও বাংলায় প্রচুর পরিমাণে টেম্পল কয়েন পাওয়া গেছে রামচন্দ্রকেন্দ্রিক। পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের এইসব মুদ্রা রাঢ় বাংলার মাটির তলা থেকেই পাওয়া গেছে। স্বপন কুমার ঠাকুর দেখিয়েছেন, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শুধুমাত্র কাটোয়া মহকুমাতেই প্রায় ২০টি প্রাচীন রামচন্দ্রের বিগ্রহ আছে।- এতকিছুর পরেও যাঁদের মনে হয় যে রামচন্দ্র বঙ্গীয় সংস্কৃতির অংশ নয়- তাঁদের হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, নচেৎ তাঁরা জেনে বুঝে মিথ্যাচার করছেন।

বাঁচতে চাই বিজেপি তাই

নরেন্দ্র মোদীর রণহুঙ্কার

জয়ন্ত গুহ

সরাসরি নরেন্দ্র মোদী বলছেন, 'দিল্লি থেকে যে পয়সা সরাসরি এখানে সরকারকে পাঠানো হয় তার বড় অংশ এখানে লুঠ হয়ে যায়।' বহুকাল আগে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বিমান বসু বলেছিলেন, 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।' এখন আর বলেন না। হতে পারে ক্ষমতা থেকে চলে গেলেও ওনারা এখন একদা বিরোধী 'অগ্নি-কন্যা'-কেই কমরেড ভাবেন। আর বিজেপি শ্রেনী শত্রু। কমরেড লুটেপুটে খেলে দোষ ধরতে নেই। জোটের ঘোঁটে তখন 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।'

দমদম জেল মাঠের সভা থেকেই ২০২৬ নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদার চাঁচল থেকে উঃ ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর পর্যন্ত দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ, বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতি তৃণমূলের ধারাবাহিক অত্যাচারে নাভিশ্বাস ওঠা বাংলা ও বাঙালীর বাঁচার সুর বেঁধে দিলেন তিনি। পাড়ায় পাড়ায়, দুয়ারে দুয়ারে তৃণমূলের দাদাগিরি ও ধর্ষন কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা লিখে দিলেন তিনি। শিল্প-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে মুখ থুবড়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সকলকে দিলেন সেই সহজ অথচ মহা মন্ত্র – বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই।

সমাবেশে আসা সৈনিকদের তিনি প্রায় ৫/৬ বার সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে নিলেন। মানে গেঁথে দিলেন মনে ও প্রাণে। কিন্তু তার আগে ও পরে তার চোখ-মুখ ও উচ্চারণে তিনি অদ্ভুতভাবে শান্ত। একেবারেই উত্তেজিত নন। এ কিন্তু ভয়ানক এক ঝড়ের ইঙ্গিত। গত তিরিশ বছরে দেশের যে সব সাংবাদিকরা নরেন্দ্র মোদীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের মতে সাধারণত নরেন্দ্র মোদীর ভাষণকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক, দলের সৈনিকদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে উত্তেজিত ভাষণে রাজনৈতিক ময়দানে উত্তাপ ছড়ানো। দুই, চোখ-মুখ-গলার স্বর শান্ত অথচ যুক্তি ও তথ্যে রাজনৈতিক বিরোধীর শেষ আত্মবিশ্বাসটুকুও কেড়ে নিচ্ছেন অবলীলায়। ঠিক যেমনটা ঘটলো দমদম জেল মাঠের জনসভায়। এক্ষেত্রে অসহায় ক্রোধে বিরোধীদের চিৎকার করা ছাড়া কিছুই করার থাকেনা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তখন পরের ৫০টি দান এবং বিজয়ের মুহূর্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

ভাষণের শুরুতেই তিনি পরিষ্কার করে দিলেন, বিকশিত ভারতের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপির অবশ্যই চাই। "জনসংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম বড় রাজ্য। যতক্ষন না পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সফল হবে না। কেননা বিজেপি মনে করে, এটা বিজেপির সঙ্কল্প যে পশ্চিমবঙ্গের উদয় হলে তবেই বিকশিত ভারতের জয়।" এত দূর অবধি ঠিক ছিল কিন্তু এরপর তিনি আপাত শান্ত স্বরে যা বলছেন তৃণমূলের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

"গত ১১ বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যের বিকাশের জন্য সব রকমের সহায়তা করেছে। বাংলায় জাতীয় সড়ক তৈরিতে ইউপিএ সরকার তাঁদের ১০ বছর মেয়াদে যে টাকা দিয়েছিল তার থেকে ৩ গুন বেশী পয়সা ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে। রেলওয়ে-র ক্ষেত্রেও বাংলার জন্য বাজেট বেড়েছে ৩ গুন। কিন্তু বাংলায় বিকাশের জন্য এক পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ আছে। দিল্লি থেকে যে পয়সা সরাসরি এখানে সরকারকে পাঠানো হয় তার বড় অংশ এখানে লুঠ হয়ে যায়। যে পয়সা ভারত সরকার এখানে পাঠায় তা আপনাদের জন্য খরচ হয় না, মহিলাদের সুখসুবিধার জন্য খরচ হয়না, ওই পয়সা এখানে টিএমসি ক্যাডারদের জন্য খরচ করা হয়।"

ভাল করে ভেবে দেখুন একবার, ঠিক কি বললেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন আমার-আপনার জন্য বাংলার সরকারকে সরাসরি পাঠানো টাকা লুঠ হয়ে যায়। মানে জনকল্যাণের জন্য পাঠানো টাকা লুঠ করছে। কারা লুঠ করছে? তা তো একটি বাচ্চা ছেলের কাছেও পরিষ্কার! টাকা তো পাঠানো হয়েছে এ রাজ্যের সরকারকে, সরাসরি পাঠানো হয়েছে। কারও মাধ্যমে তো পাঠানো হয়নি। মানে দেশের টাকা, সরকারি টাকা, জনগণের টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে যখন সেই টাকা এই রাজ্যের সরকারের কাছে সরাসরি আসছে এবং হাস্যকর হলেও সেই টাকা পাচ্ছে তৃণমূল ক্যাডাররা! মনে পরে যাচ্ছে বিমান বসুর কথা। এখন নবান্নে বসে ফিশফ্রাই খাওয়া বিমান বাবু বহুকাল আগে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।" এখন আর বলেন না। হতে পারে ক্ষমতা থেকে চলে গেলেও ওনারা এখন একদা বিরোধী 'অগ্নি-কন্যা'-কেই কমরেড ভাবেন। আর বিজেপি শ্রেনী শত্রু। কমরেড লুটেপুটে খেলে দোষ ধরতে নেই। জোটের ঘোঁটে তখন 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।'

তৃণমূলের মহা-লুঠ নিয়ে খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী এতবড় একটা বোমা ফাটানোর পরও তৃণমূল চুপ। কি অদ্ভুত! উচিৎ ছিল তো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানো। আমরণ অনশন করা। প্রতিবাদে উত্তাল হতে পারত লোকসভা। কিন্তু কোথায় কি? সব ভো ভা। গায়েব! ছিঁচকে চোরের মত গায়েব। এতবড় 'কার্পেট বম্বিং'-এর পর সবাই

ভেবেছিল প্রধানমন্ত্রী বোধহয় আর তেমন আক্রমণ করবেন না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সেদিন বিধ্বংসী মুডে। সরাসরি বলে দিলেন, "যতদিন না তৃণমূল সরকার যাচ্ছে, বাংলার বিকাশ আটকে থাকবে। তৃণমূল গেলেই হবে আসল বিকাশ···এমন অবস্থা আসাম, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যাতেও ছিল। আজ ওখানে বিজেপির সরকার। বিকাশের স্রোতে ভাসছে ৩ রাজ্য··· সুতরাং বাংলার বিকাশের জন্যও পরিবর্তন দরকার। এটা এখন নিশ্চিত যে এ রাজ্যেও তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে।

তিনি তার ভাষণ শেষ করছেন বাংলায় অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে। তিনি খুব ভাল জানেন, দেশভাগের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলার বিকাশে সবচেয়ে বড় বাঁধা এই অনুপ্রবেশ। জেনেবুঝে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া অবস্থান নেয়নি নেহরু-ইন্দিরা সরকার এবং জেনেবুঝেই সিপিএম-তৃণমূল ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে প্রশ্রয় দিয়েছে অনুপ্রবেশকে, স্বাভাবিক ভাবেই পিছিয়ে গেছে বাংলা। পরিযায়ী শ্রমিক এখন বাংলার পরিচয়। বাংলাকে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদীর সাফ কথা, যে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের নতুন প্রজন্মের রোজগার ছিনিয়ে নিচ্ছে, আমাদের মা-বোনেদের অত্যাচার করছে, দেশের কল্যাণে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁদের আমরা ভারতে থাকতে দেবনা···সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপ্রবেশকারীরা তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রশ্রয়ে এক সামাজিক সঙ্কট তৈরি করছে, কৃষকের জমি জোর করে দখল করে নিচ্ছে, আদিবাসীদের ঠকিয়ে তাঁদের জমির দখল নিচ্ছে, দেশ এটা সহ্য করবে না। নকল পরিচয়পত্র বানিয়ে যারা আমাদের ছেলেমেয়েদের রুটিরুজি কেড়ে নিতে এসেছে, তাদের যেতে হবেই।

সবাই ভেবেছিল এখানেই শেষ। কিন্তু না। কফিনে শেষ পেরেকটাও তিনি পুঁতে দিলেন এক সাংঘাতিক লাইনে। তিনি বলছেন, অনুপ্রবেশকারীদের যেতে হবেই কিন্তু সততার সঙ্গে নির্বিঘ্নে সেই কাজ করার জন্য তৃনমূলকেও চলে যেতে হবে।

কিন্তু এই কাজ মোদী বা বিজেপি নয়। মোদীর কথায়, এটা করার শক্তি আছে শুধু আপনার ভোটে। বাংলার বিকাশের স্বার্থে, তৃণমূল ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আমার-আপনার সবার ভোট বিজেপির জন্য। প্রতিদিন মাথায় রাখুন একটাই লাইন—

বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই।

উদয়ের পথে বাংলা

পশ্চিমবঙ্গে মেট্রো ও সড়ক পরিবহণে মোদীর একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা

বিনয়ভূষণ দাশ

কলকাতায় একগুচ্ছ মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করেও প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বললেন, বাংলার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ইতোমধ্যেই হাজার হাজার কোটি টাকার নানা প্রকল্প এনেছে। কিন্তু সেইসব প্রকল্পের সুফল বাংলার মানুষের কাছে পৌছচ্ছে না। তাঁরা উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বাইশে আগস্ট দমদম জেল মাঠের সভায় তিনি বাঙ্গালী ও বাংলার স্বাভিমান উদ্দীপ্ত করে বললেন, 'বাংলার মাটি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তদের। তাঁরাই দেশে মানুষের চেতনার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটিয়েছেন। এই বাংলা শুধু পুনর্জাগরণের কেন্দ্র নয়, এখান থেকেই উদ্বোধিত হয়েছে, উঠো, জাগো, যতক্ষণ না ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাঁতে পারছো ততক্ষণ অবধি চলতে থাকো।' আর তাই সত্যিই বাংলায় নতুন আলোর প্রয়োজন, সত্যিই পরিবর্তন প্রয়োজন' বাংলা ভাষা এবং বাংলার সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে হবে, তাকে রক্ষা করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী সেদিনই কলকাতাকেন্দ্রিক তিনটি নতুন মেট্রো পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করেন। কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারিত তিনটি নতুন রুটের উদ্বোধন করে শ্রীমোদী ঘোষণা করলেন,' বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক এখন ভারতে, এই কোলকাতায়। ২২ আগস্ট যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন অবধি অংশে মেট্রো চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শ্রীমোদী। ওই স্টেশন থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া– বিমানবন্দর রুট) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন (রুবি) থেকে বেলেঘাটা স্টেশন এবং গ্রিন লাইনের (সেক্টর ফাইভ– হাওড়া ময়দান রুট) এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে শিয়ালদহ স্টেশন অংশে মেট্রো চলাচলেরও আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তিনি। এই প্রকল্পের ফলে ১৩.৬১ কিলোমিটার দুরত্বের মেট্রো রুট সম্প্রসারিত হল। এই সম্প্রসারণের ফলে বিমানবন্দর ও কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। মেট্রো প্রকল্পগুলির শিলান্যাস করার পরে তিনি যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন অবধি মেট্রোতে যাতায়াত করেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

শ্রীমোদী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উন্নয়ন খাতে মোট ৫২০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ছয়-লেন কোনা

এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এই রাস্তাটি ৭.২ কিলোমিটার দুরত্বের। এই প্রকল্পের ফলে হাওড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং যাতায়াতের সময় অনেক কম লাগবে।

তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরের মতই পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশী হতে পারেননি বলে মনে হয়। তিনি এমনকি শিষ্টাচার মেনে সরকারী ওই সভায় উপস্থিত হবার সৌজন্যও দেখাতে পারেননি। অভিজ্ঞ মহলের মতে, তাঁর এই পদক্ষেপ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং খুব হিসেব কষে করা এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ এটি। এই অনুপস্থিতি দ্বারা তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চান এবং তাঁর আক্রমণের ধার আরও তীক্ষ্ণ করতে চান বলেই মনে হয়। তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী দ্বারা এই ঘোষণায় খুব 'নস্টালজিক' হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, তিনি নিজেই নাকি কলকাতা এবং তার আশপাশের মেট্রো প্রকল্পগুলি অনুমোদন করেন। যদিও তিনি কবে এই অনুমোদন করেছিলেন তার কোন উল্লেখ করতে পারেননি। অবশ্যই এটা তাঁর চিরাচরিত হিংসুটে স্বভাবের পরিচায়ক। অন্য যে কারো অবদানই তাঁর চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। তিনি কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী থাকাকালে কয়েকটি নতুন ট্রেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঘোষণা করলেও রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে কিছুই করেননি। বরঞ্চ তিনি যথাযথ সহায়তা না করায় অনেক ক্ষেত্রেই রেলের বিভিন্ন প্রকল্প বিলম্বিত হয়েছে। ইংরাজ আমলে বিভিন্ন রেল সেকশন গঠিত হওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের আগে বাস্তবে কোন আধুনিক পরিকাঠামোই গড়ে উঠেনি। বস্তুত, নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরেই পশ্চিমবঙ্গের আদ্যিকালের রেল স্টেশনগুলির আবার হাল ফিরে পেয়েছে, রেলের আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের রেল স্টেশনগুলি ঘুরলেই সেটা মালুম হয়। আর তাই মোদী সরকারের এই উন্নয়ন প্রকল্পের সরাসরি বিরোধিতা করতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তিন বিশ্বস্ত সাগরেদ, দাগি আসামী ও দলীয় মুখপাত্র কুনাল ঘোষ, অর্ধশিক্ষিত মহুয়া মৈত্র এবং শশী পাঁজাকে বাংলার স্বার্থবাহী প্রকল্পগুলির বিরোধিতায় লাগিয়ে দেন। যদিও এইসব তথাকথিত নেতাদের কোন বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই বাংলার মানুষের কাছে! দমদমের ওই সভায় মমতার নাম উল্লেখ না করায় তাঁদের নাকি খুব গোসা হয়েছে! কিন্তু, কবে, কোথায় মমতা এই প্রকল্পগুলি ঘোষণা করেছিলেন তা উল্লেখ করার লজ্জা তাঁদের ভাঙ্গেনি!

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলীয় সতীর্থরা শুধু বিজেপি এবং মোদী বিরোধিতার উপর টিকে আছে। একসময় এই কাজটিই করত সিপিএম তথা বামপন্থী দলগুলি। বাস্তবিক, মমতা সিপিএমের উপযুক্ত শিষ্যা! কিন্তু দলগুলি বোধহয় আদৌ সচেতন নয় যে ইদানীং সময় পাল্টেছে; রাজ্যের মানুষ আর এই ধরণের গিমিকে বিশ্বাস করে না। তাঁরা বাস্তবিক কাজ চায়, গিমিক নয়। মমতা এবং সিপিএম দলের নেতা ও কর্মীদের নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। শুধু গিমিক দিয়ে আর ভোলানো যাচ্ছে না সাধারণ নাগরিকদের। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশে দেশে আজ বিদ্রোহ! পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিগ্রস্ত, অপদার্থ সরকারের অপসারণ চায় রাজ্যের মানুষ; শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা!

অবশ্য মোদী এবং বিজেপি বিরোধিতায় পিছিয়ে থাকেনি এরাজ্যে সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাওয়া সিপিএম এবং কংগ্রেসও। সুজন চক্রবর্তী এবং অধীররঞ্জন চৌধুরী যথারীতি বিজেপি ও শ্রীমোদীর বিরুদ্ধে কামান দেগেছেন। সুজন চক্রবর্তী শ্রীমোদীর ঘোষণাকে শুদ্ধ 'প্রতারণা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এইসব প্রকল্পের নকশা নাকি তাঁরাই প্রথম করেছিলেন! অবশ্য তিনি বলতে ভুলে গেছেন, তাঁদের ওই তথাকথিত সাধের প্রকল্প তাঁরা বাস্তবায়িত করেননি কেন! কবে তাঁরা এই নকশা তৈরী করেছিলেন! সুজন চক্রবর্তী অবশ্য তাঁর মন্তব্যে তাঁর দলীয় সতীর্থ তথা কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং তাঁর কন্যা বীণা বিজয়নের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন! এমনকি তাঁদের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর শাসনকালের অনেক দুর্নীতি ঢেকে রাখতে পারলেও কিন্তু শুভব্রত বসু (চন্দন বসু) এবং আরও বেশ কয়েকটি দুর্নীতির কথা জনমানসে দগদগে ঘায়ের মত স্মরণে আছে! রাজ্য কংগ্রেসও একই ধরণের অভিযোগ করেছে মোদী সম্পর্কে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী মোদীর পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার সফরকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য রাজ্যে অধীর চৌধুরীর কথার কোন গুরুত্ব কেউ দেয় বলে মনে হয়না; আর মুর্শিদাবাদ জেলার নাগরিকেরা অধীর চৌধুরীর কুকীর্তির কথা ভালো করেই জানে!

যাইহোক, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের এই কৃতিত্ব পাওয়ার কাড়াকাড়ি দেখে একটা বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায়, মোদী কাজ করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মেট্রো এবং সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির এই উদ্যোগের ফলে এই দলগুলি বাস্তবিক বিশেষ চিন্তায় পড়েছে। শুধু কথার ভেল্কি দেখিয়ে যে নির্বাচনের তরী আর তীরে ভেড়ানো যাবে না তা তাঁদের বেশ ভালো করেই মালুম হচ্ছে।

কিন্তু এহ বাহ্য! সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, যাত্রী সাধারণ এবং রাজ্যের সাধারণ নাগরিকেরা যানজট এড়িয়ে নানা পথে যাতায়াতের এবং সময় মত গন্তব্যে পৌঁছানোর সুবিধা পেয়েছেন তাতে খুশী। তাঁরা খুশী, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ বেড়ে যাওয়ায়। কলকাতার মানুষ তাই এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হওয়ায় উল্লসিত। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীর কাছে ধন্যবাদার্হ।

ভারতীয় সেনাকে অপমান করে

দেশকেই অপমান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বাতী সেনাপতি

রাজ্যের একজন ভারতীয়ও কি মেনে নেবে মমতা ব্যানার্জির ভারতীয় সেনাকে অপমান? তাঁকে দেখে সেনা পালিয়ে গেছে, মানে কি? ২০০ জন দূরের কথা, ভারতীয় সেনাকে নিয়ে এমন কল্পনা আসে কি করে? ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় সেনার ভয়ে পালিয়েছিল পাক সেনারা। আর আজ স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে ভারতের এক মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখছেন তার ভয়ে দেশের সেনারা পালাচ্ছে? যে ধারণা দেশের কোনও ইশকুলের বাচ্চাদের মনেও আসেনা, সেই ভাবনা আসে কি করে মুখ্যমন্ত্রীর? উনি সুস্থ তো?

আবারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেনাকে অপমান করার অছিলায় কি ভয়ঙ্কর কথা বলে ফেললেন তিনি? বললেন ২০০-এর বেশি সেনা নাকি তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। আর তারপরই দেখা যায় ভারতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনার গাড়ি আটকে দিল তৃণমূল সরকার। তবে এটাই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার সেনাকে নিয়ে হাস্যকর নানা মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী। যা নিয়ে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগে বৈকি।

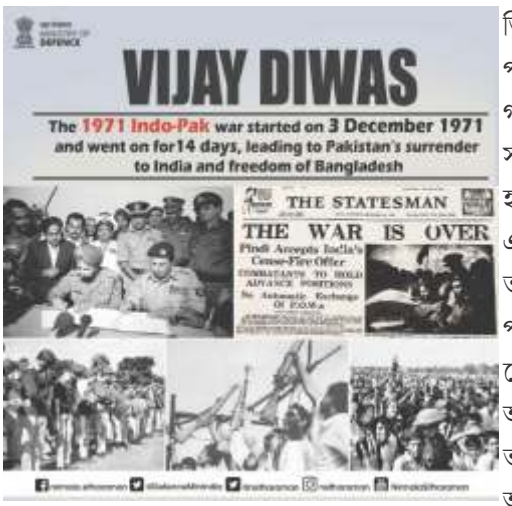

ভারতীয় সেনা 'পালিয়ে' যায় না,
বুক চিতিয়ে দেশকে রক্ষা করে।

প্রতিবেদন শুরুর আগে আপনাদের একটা আইনের বিষয়ে আপনাদের জানিয়ে রাখি। The Representation of the People Act-এ বলা হয়েছে কোনও জনপ্রতিনিধি মানে ধরুন মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বা বিধায়ক যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হন তাহলে তাঁর পদ চলে যেতে পারে। এই অধিকার রয়েছে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের। তাঁরা একটা মেডিকেল প্যানেল বসিয়ে সেই ব্যক্তির মস্তিষ্কের সুস্থতা পরীক্ষা করেন এবং যদি সত্যিই তিনি পাগল হন তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ভারতবর্ষে এই উদাহরণ এখনও পর্যন্ত একটিও নেই। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যা পরিস্থিতি চলছে তাতে করে মনে হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে উঠতেই পারে এই প্রশ্ন।

এর আগেও একাধিকবার তিনি সেনা নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন। যা শুনলে প্রলাপ বলেই মনে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ত ধারণা নেই ভারতীয় সেনার শৌর্য্য, বীর্য, ক্ষমতা সম্পর্কে। চুরির বাইরে কোনও খবরই তিনি রাখেন না। তাই নানা সময় নানা বিরূপ মন্তব্য করেন আর সব সময় নিজের গদি হারানোর ভয় করেন। গদি হারানোর ভয় কেন বলছি? শুনুন তাহলে। ২০১৬ সালে এক কাণ্ড করেছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেছিলেন, ডানকুনি, পালসিট এবং মুর্শিদাবাদে টোল প্লাজায় গাড়ি থামিয়ে সেনা তল্লাশি চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছেন, নাকাল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, এখানে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে নাকি? তবে কি অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার পাশাপাশি গোটা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হল? আমাদের নির্বাচিত সরকার। আমি সেনার হাতে ছেড়ে দেব না।" তিনি ভয় পেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বুঝি সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে আর সেনাবাহিনী তাঁকে গদিচ্যুত করবে। সেই ভয়ে সারারাত তিনি নবান্নে কাটিয়েছিলেন। পরে রাহুল গান্ধীকে ফোন করে মমতা তাঁকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলা সেনার 'দখলে' চলে গিয়েছে। এটি সেনা অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এমনটা ভাবতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী কি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ ভাবেন? যে যখন তখন সেনা এসে গদি উল্টে দেবে?

তাঁর এই অভিযোগের পর সেনা জানিয়েছিল এটা তাদের রুটিন কর্মসূচি। কখনও যুদ্ধের পরিস্থিতি হলে রসদ ও পানীয় জল বিভিন্ন ছাউনিতে পৌঁছনোর জন্য প্রচুর মালবাহী গাড়ির প্রয়োজন হয়। সেই কারণেই চলছিল সমীক্ষা আর তারা কলকাতা

পুলিসকে জানিয়েই চালিয়েছিল সমীক্ষা। সেদিনও জলজ্যান্ত মিথ্যা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর এদিনও বললেন তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল সেনা।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ত ভুলে গেছেন যে সেনা বুক চিতিয়ে পাকিস্তানের মোকাবিলা শুধু করে তাই নয়, তারা পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে জঙ্গিদের খতমও করে আসে। অবশ্য সেটা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী অপমান করতে ছাড়েনি। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিঁদুর বেচতে এসেছেন। এর আগেও বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হামলা যে হয়েছে তার প্রমাণ কোথায়!

ভাবুন! কোনও সুস্থ মাথার মানুষ এটা বলতে পারে? কোনও ভারতীয় ভারতে দাঁড়িয়ে এসব বলতে পারে? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় মাঝে মাঝে ভুলে যান তিনি আসলে কোন টিমে? মানে টিম ভারত নাকি টিম বাংলাদেশ-পাকিস্তান? তৃণমূল সরকারের হাবভাব দেখে প্রশ্ন জাগে এটা তৃণমূলের মা-মাটি-মানুষের সরকার নাকি মা-মাটি-মুনীরের সরকার? সেনাকে অপমানের নেপথ্যের কারণ আতশ কাঁচ দিয়ে খুঁজলে দেখা যাবে শুধুই সস্তা রাজনীতি এবং ভয় - তা সে ২০১৬ সাল হোক বা হালফিলের ঘটনা। সাধারণত যাঁরা মেগালম্যানিয়াক হন, তাঁদের মধ্যে এই জিনিসটা আরও বিশেষভাবে দেখা যায়। ইতিহাস বলছে সে চেঙ্গিস খানই হোক বা হিটলার সব ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে এই ধরনের স্বৈরাচারী রাজারা সবসময় ক্ষমতা হারানোর ভয় পেয়েছেন। ক্ষমতা ধরে রাখতে অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করতেন এবং নিজের আশেপাশের ব্যক্তিদেরও তারা বিশ্বাস করতেন না। নিজের সেনাবাহিনীর উপরেও থাকতো কড়া নজরদারি, কোথাও সন্দেহ হলেই তাদের খুন করতে পিছপা হতেন না এইসব স্বৈরাচারী নেতৃত্বরা। বিশ্বাস করতেন না নিজের ছায়াকেও। তেমনই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও।

ভারতীয় সেনা পালায়না, নাম শুনলে কেঁপে ওঠে পাকিস্তান।

দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ সফরে এলে মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গকে শাসন করতে চাইছে। কখনো প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে এলে তাকে বলেন কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে ঢোকাবো আবার কখনো বা তিনি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসিত আক্রমণ করেন। তার আক্রোশ থেকে বাদ যান না ভগবান পুরুষোত্তম শ্রী রামও। সবকিছু নিয়ে একটা ইনসিকিউরিটি থাকে বলেই তিনি অযথা আক্রমণ করেন। বাদ দেন না ভারতীয় সেনাকেও। তাদেরকেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। তাই মেয়ো রোডে তৃণমূলের বাঁধা মঞ্চের অনুমতির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই সেনা সেই মঞ্চ খুলতে এলে তা নিয়েও রাজনীতি করতে ছাড়েন না মুখ্যমন্ত্রী। দেশের সেনাকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেন।

তাঁর আচার আচরণ দেখে মনে হয় যেন একটা সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সৌজন্যতা দেখিয়ে চুপ করে থাকার অর্থ যে দুর্বলতা নয় সেটা সেনারা এবার দেখিয়ে দিয়েছে। সমস্ত তথ্য দিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে ধর্ণায় বসছেন প্রাক্তন সেনা কর্তারা। কারণ দেশের ভিতর হোক বা বাইরে, সেনার অপমান হলে সেই জবাব সেনাই তো দেবে।

১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধে ৯০,০০০-এর বেশী পাক সেনা আত্মসমর্পন করেছিল ভারতীয় সেনার কাছে।

কার্গিলে কি ভারতীয় সেনা পালিয়েছিল নাকি ঝামা ঘষে দিয়েছিল শত্রুর মুখে?

ছবিতে খবর

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, বিকশিত ভারতের সঙ্কল্প নিয়ে সল্টলেক অল্টেয়ারে আয়োজিত 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মশালায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বগণ।

সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বাঙালির আত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তৃণমূলের অপমানের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিবাদ পদযাত্রায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

বুথ সশক্তিকরণ অভিযানের প্রদেশ প্রমুখ এবং সহ প্রমুখদের সঙ্গে সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে বিজেপির 'সেবা পক্ষকাল ২০২৫' উপলক্ষ্যে বিশেষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

শিকাগো বক্তৃতার ঐতিহাসিক দিনে আসানসোল সাংগঠনিক জেলার ধাদকা পলিটেকনিক ময়দানে 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টে-এর শুভ উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

খড়দহ বন্দিপুর সম্মিলনী মাঠে 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টে-এ উপস্থিত আছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য সহ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

খাস কলকাতায় নারী পাচারের চক্র! উদ্ধার ১১ জন নাবালিকা! ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি উত্তর কলকাতা মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচি।

কলকাতা জোনের ৭টি সাংগঠনিক জেলার মন্ডল সভাপতি প্রশিক্ষন বর্গের দ্বিতীয় দিনে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ছবিতে খবর

হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর জোনের মন্ডল সভাপতিদের কর্মশালায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ জোনের মন্ডল সভাপতিদের কর্মশালায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

দমদমের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি পরিবারের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনার ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য নেতৃত্ব।

বাংলা ভাষায় বিশ্ববন্দিত বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি মালদার চাঁচলে তৃণমূলের অপমানের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিজেপির বিক্ষোভে জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

মায়াপুরে নবদ্বীপ জোনের 'মন্ডল সভাপতি কর্মশালা'-য় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ববর্গ।

আসানসোলে রাঢ়বঙ্গ জোনের 'মন্ডল সভাপতি কর্মশালা'-য় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ববর্গ।

কলকাতা জোনের 'মন্ডল সভাপতি কর্মশালা'-য় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ববর্গ।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ জোনের মন্ডল সভাপতি কর্মশালায় বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ববর্গ।

বাঙালির আত্মা বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি মালদার চাঁচলে তৃণমূলের অপমানের প্রতিবাদে দক্ষিণ মালদা জেলা মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচী।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতা হাসপাতাল থেকে ১১ দিনের একটি শিশুকে তৃণমূল কংগ্রেসের এক মহিলা কর্মী চুরি করে নিয়ে ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচি।

শিক্ষক দিবসে বিজেপি টিচার্স সেলের উদ্যোগে কোলকাতার ভারত সভাগৃহে সম্মানীয় শিক্ষকদের সম্বর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, সম্মানীয় শিক্ষাবিদ ও রাজ্য নেতৃত্বগণ।

ছবিতে খবর

জেলায় জেলায় 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব সহ সকল কর্মীবৃন্দ।

তৃণমূলী হিন্দু সন্ত্রাস কি ক্ষমা করবে

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নমঃশূদ্ররা?

কুশল নস্কর

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্তরিক উদ্যোগে যে পশ্চিমবঙ্গ নামক অঙ্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের বিতাড়িত হিন্দুদের আশ্রয় প্রদান, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন সাংসদ কোন হিন্দু নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষকে অপমান করার দুঃসাহস কোথা থেকে পান? আগামী নির্বাচনে এই পাহাড় প্রমাণ স্পর্ধাকে প্রতিহত করার শপথ নিন; বিসর্জন দিন তৃণমূলের।

গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ করিমপুর দুই ব্লকের এক সভায় কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে সেই বক্তৃতাটি শুনেছেন। সেই বক্তৃতার আক্রমণের লক্ষ্য কারা? তফশিলি জাতির মানুষ, মূলত নমঃশূদ্ররা; যাদের অনেকেই 'কাঠের মালা' পরেন। তাঁদের প্রতি সাংসদ মহোদয়ের মনে খুব রাগ। কেন? কারণ তাঁরা সারা বছর সরকারি সব প্রকল্পের সুবিধা নেন আর ভোটের সময় বিজেপিকে ভোট দেন; তাই একেবারে সরাসরি হুমকি!

ওই দলেরই আরেক প্রাক্তন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এই ঘটনার দিন চারেক আগেই বিবৃতি দিয়েছেন 'মতুয়াদের হিন্দু বানাচ্ছে বিজেপি'। আরেক তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, যিনি আবার দলিত সাহিত্য একাডেমির প্রধান, শাসকদলের দলিত মুখ; নমঃশূদ্রদের জন্য খুব চিন্তিত, নমঃশূদ্রদের জন্যই ভাবেন, লেখেন ইত্যাদি। গত ২৯ জুলাই ২০২৫ সমাজমাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে একটি দীর্ঘ পোষ্ট দিয়েছেন; সেখানে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু তাঁকে কেন উদ্বাস্তু হতে হল, সেই নিয়ে একটি শব্দ খরচ করার সাহস তাঁর হয়নি!

মহুয়া মৈত্রর বক্তব্যের ওই শ্রোতৃবর্গ, করিমপুর দুই ব্লকের ওই তফশিলি জাতির মানুষরা, মমতাবালা ঠাকুরের অনুসারী মতুয়ারা বা মনোরঞ্জন ব্যাপারীর পোষ্টের পাঠকেরা অনেক কিছু ভুললেও পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে তাঁদের উদ্বাস্তু হওয়ার কারণটি এখনও ভোলেননি, তা হয়তো আমরা বিশ্বাস করতে পারি। যে শক্তি তাঁদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছিল, সেই শক্তি যে বর্তমানে

পশ্চিমবঙ্গেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল, তা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন; আর রাজ্যের শাসকদল যে সেই শক্তির অন্যতম দোসর, তা তো মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

মহুয়া মৈত্র যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন সেখানকার সিংহভাগ নমঃশূদ্রই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। এখনও হয়তো তাঁদের বাড়ির ট্রাঙ্কে সযতনে রক্ষিত আছে কুষ্টিয়া বা পাবনার জমির দলিল। মমতাবালা যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই মতুয়াদের নেতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কেবল নিজের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার বলে পূর্ববঙ্গের ওড়াকান্দি ছেড়ে মতুয়া সংগঠনের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে, কেবল তাই-ই নয়, তাঁর অনুসারী সকলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের প্রধান দুজন নেতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর; যার অনুগামীরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে প্রাণে বেঁচে ছিল। কিন্তু নমঃশূদ্রদের আরেক বিখ্যাত নেতা, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম মুখ, পরে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের অনুসারীদের ঠিক কী পরিণতি ঘটেছিল, তাও খানিকটা জানা প্রয়োজন।

সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় থেকে মূলত হিন্দু উচ্চবর্ণের বিত্তশালী পরিবারের সদস্যরা পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে থাকে; কারণ এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ছিল। ফলত, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের একটি দূরত্ব আগাগোড়া বজায় ছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান গড়ে ওঠার পর এসকল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন অনুধাবন করল ক্ষমতার হাতবদল ঘটতে চলেছে, তখন তাঁরা নিজ সম্মান বাঁচানোর তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ক্ষমতায়নের নিরিখে উচ্চবর্ণের একেবারে বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত ছিল; তাঁরা ছিল মূলত কৃষিজীবী ও অন্যান্য কায়িক শ্রমকেন্দ্রিক পেশার সঙ্গে যুক্ত। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে প্রান্তিক অবস্থানে থাকার দরুন সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সঙ্গে তাঁরা এক ধরনের সমভাব অনুভব করতেন। সেকারণে মুসলিম লিগ যখন পাকিস্তানের দাবিতে সোচ্চার হয়, পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের অন্যতম নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলও তাতে সুর মেলান। নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বও জুটেছিল তাঁর। যদিও পরবর্তীকালে মাননীয় মন্ত্রীকে রীতিমতো এপার বাংলায় এসে পদত্যাগপত্র লিখতে হয়েছিল।

সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। তবে স্বাধীনতা-পূর্ব আমলে মুসলিম লিগ উচ্চবর্ণের তথা সামন্ত হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত সমগ্র নিম্নবর্ণের হিন্দুদের যে 'ওয়াদা' প্রদান করেছিল; মুসলমান কৃষিজীবীদের সঙ্গে হিন্দু কৃষিজীবীদের এক পংক্তিতে শামিল করেছিল; তা যে কেবল ক্ষমতা দখলের জন্য নির্মিত একটি রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, তা ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু বা চাকরিজীবীদের মতো তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। সামান্য কিছু চাষের জমির উপর নির্ভর করেই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করত। তাই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন দেশত্যাগ করছে তখনও তাঁরা দেশত্যাগের কথা ভাবেনি কারণ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে তাঁরা সংখ্যাগুরু মুসলিম কৃষিজীবীদের সঙ্গে একই পঙক্তিভুক্ত ছিল। তবে অর্থনীতির মানদণ্ডে তাঁরা সমগোত্রীয় হলেও ধর্মীয় পরিচয়ে তাঁরা ভিন্ন। কালক্রমে শুধু এই ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখেই মুসলিম লিগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের চাষের জমি দখল হতে থাকে; একতরফা দাঙ্গা, ডাকাতির মাধ্যমে তাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত ধর্ষিতা হতে থাকে; মেয়েদের সম্ভ্রমহানি ঘটানো হয় ব্যাপকভাবে। এরকম অবস্থায় যে নিম্নবর্ণের হিন্দু সংখ্যালঘুরা ভেবেছিল, তাঁদের তো পার্থিব সম্পদ কিছুই নেই, তাঁরা হয়তো তাঁদের প্রাণটুকু নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে টিকে থাকতে পারবে, তাঁরাও শেষাবধি ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়।

নিম্নবর্ণের এই মানুষেরা, যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে

পশ্চিম পানে পা বাড়াল, নিজ ধর্ম, নিজ সম্ভ্রম টিকিয়ে রাখার আশায়, এপারে এসে তাঁরা এক অকূলপাথারে নিমজ্জিত হল। এমনিতেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর অবিরাম আগমনে ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে থাকে। তার উপরে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া গেল অপরিসীম বঞ্চনা ও উদাসীনতা। তার উপরে পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়া রাজনীতির কারণেও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে আগত পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সূচনা করে। প্রাকৃতিকভাবে ঊষর, বৃষ্টিপাতহীন দণ্ডকারণ্যে যাদের পুনর্বাসন করা হয়, তাঁরা সকলেই ছিলেন পরবর্তীকালে আগত তফশিলি জাতির, মূলত নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষ।

এই দণ্ডকারণ্যেই বেড়ে উঠেছেন বিধায়ক মশাই। কত কষ্ট করে বেড়ে উঠেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন; কিন্তু কেন নিজের শস্য শ্যামল উর্বর ভিটেমাটি ছেড়ে ঊষর দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিতে হল, সে ব্যাপারে যথারীতি নীরব থেকেছেন। এই পাহাড়প্রমাণ ভণ্ডামি এদের একমাত্র অলংকার। স্বাধীনতা পূর্বসময়ে গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যেভাবে প্রচার চালিয়েছিলেন, যেভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে পাকিস্তানের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নমঃশূদ্রদের হিন্দু ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা; আজ মমতাবালা, মনোরঞ্জনরা সেই একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছেন। নমঃশূদ্রদের সেই নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে রীতিমত পালিয়ে এসে মন্ত্রিসভা ইস্তফাপত্র দিতে হয়। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল, ১৯৫০ সালের সেই ঘটনায় ঢাকা বরিশালসহ সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে প্রায় দশ হাজার হিন্দু, মূলত নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষকে রীতিমতো কচুকাটা করা হয়েছিল। শেষমেষ সব হারিয়ে যোগেনবাবুর সমর্থকরা আশ্রয় পেয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে। সেখানে তাঁরা মনুষ্যেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন।

নমঃশূদ্র পরিচয় নিয়ে কি তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের থাকতে পেরেছিলেন? পারেননি। কেবল ধর্ম পরিচয়ের কারণে তাদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। সেই ইতিহাস ভুলানোর চেষ্টায় রত এই সাংসদ, বিধায়করা। ছেচল্লিশের নোয়াখালি গণহত্যা থেকে আজ পর্যন্ত অপার বাংলায় হিন্দু নিধন চলছে ধারাবাহিকভাবে। প্রায় এক বছর পূর্বে গত আগস্টে বাংলাদেশে তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে যে মৌলবাদী সরকার এসেছে, তাদের শাসনামলে এমন একটি দিনও যায়নি, যেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারিত হননি। সাধারণ নিরীহ

প্রান্তিক হিন্দুকে নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে যার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত লালমণিরহাটের পরেশ চন্দ্র শীল ও বিষ্ণু চন্দ্র শীল। কুমিল্লার মুরাদনগরে হিন্দু নারীকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করে তার ভিডিও চিত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আন্তর্জালে; বলে দেওয়া হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে যদি থাকতে হয় তাহলে বিধর্মীদের ঠিক এভাবেই থাকতে হবে। এই বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে তাঁদের নিরাপত্তা হীনতার ভয় গ্রাস করছে আষ্টেপৃষ্ঠে। ভারতীয় জনতা পার্টি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সকল হিন্দুদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে আনয়ন করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যার মধ্য দিয়ে বিতাড়িত হিন্দু শরণার্থীরা সম্মানের সঙ্গে ভারতে আশ্রয় পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পেয়ে থাকবে। কেবল ওপার বাংলা নয়, এপার বাংলাতেও ইসলামিক মৌলবাদের সাম্প্রতিকতম শিকার মুর্শিদাবাদের চন্দন দাস ও হরগোবিন্দ দাস। ইসলামিক আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ শিকার এই দুই হতভাগ্য হিন্দুর জন্য বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি।

দেশভাগ উত্তর সময় থেকে আজ অবধি সর্বাধিক ভাগ্যহীনতার শিকার তফশিলি জাতির মানুষ; যাদের মধ্যে অন্যতম হল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। আজ তাঁদের সংস্কৃতি তৃণমূলী সাংসদের আক্রমণের শিকার; আজ 'কাঠের মালা' সাংসদের গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে। আসলে এই সাংসদের চিন্তাভাবনার প্রতিটি স্তরে রয়েছে চূড়ান্ত হিন্দু বিদ্বেষ। আজ এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সাংসদের বক্তব্যের নিন্দা করে তাঁর দল থেকে কোন বিবৃতি আসেনি। যার অর্থ তাঁর দলও তাঁর এই অভিমতকে সমর্থন করছে। সরকারি প্রকল্পের অর্থ জনগণের করের অর্থ, তা কোন সাংসদ বা রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত অর্থ নয়; অথচ যে ভঙ্গিতে, যে বেপরোয়া স্পর্ধায় তফশিলি জাতির মানুষদের আক্রমণ করা হচ্ছে, তা থেকে বোধ হচ্ছে সাংসদ যেন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উক্ত সুবিধাগুলি দান করছেন! এই অশ্লীল আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আমাদের প্রত্যেকের আশু কর্তব্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্তরিক উদ্যোগে যে পশ্চিমবঙ্গ নামক অঙ্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের বিতাড়িত হিন্দুদের আশ্রয় প্রদান, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন সাংসদ কোন হিন্দু নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষকে এই ভাষায় হুমকি দেওয়ার দুঃসাহস কোথা থেকে পান? আগামী নির্বাচনে এই পাহাড় প্রমাণ স্পর্ধাকে প্রতিহত করার শপথ নিন; এদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করুন।

দীপাবলির আগেই ধামাকা

মধ্যবিত্তের দীপাবলি এখন প্রতিদিন

সামগ্রী	UPA সরকারের আমলে কর	NDA সরকারের আমলে কর
টুথপেস্ট	27%	5%
টুথপাউডার	17%	5%
চুলের তেল	27%	5%
টয়লেট সাবান	27%	5%
টেবিলওয়্যার ও কিচেনওয়্যার	28%/18%	5%
UHT দুধ (Ultra High Temperature Milk)	6%	0%
চিনির মিষ্টি (Sugar Boiled Confectionery)	21%	5%
সব ধরনের ডায়াগনস্টিক কিট ও রিএজেন্ট	16%	5%
এয়ার কন্ডিশনার	31.3%	18%
সেলাই মেশিন	16%	5%
সাইকেল (মোটর ছাড়া)	22%	5%
সিমেন্ট	29%	18%
হোটেল ভাড়া (₹7500 পর্যন্ত প্রতিদিন)	9%	5%
পণ্য পরিবহনের থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স	15%	5%

মধ্যবিত্তের ঘরে আলোর উৎসব, মোদী সরকারের কল্যাণে

জাতীয় স্বার্থও জাতীয় মর্যাদার বিদেশনীতি

আবীর রায়গাঙ্গুলী

ভারতের অগ্রাধিকার হল কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা। মার্কিন ঘনিষ্ঠতা, রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা— সবকিছুর মধ্যেই ভারত তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ভারত এই বহুমুখী কূটনীতিতেই দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক উভয় অঞ্চলে তার নেতৃত্বকে সুসংহত করে চলেছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যতই প্রবল হোক না কেন, এই সমীকরণের মূল ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে ভারত নিজেকে প্রমাণ করেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সবসময়ই এক জটিল বাস্তবতার মধ্যে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত কখনো নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে, কখনো জোটবদ্ধ রাজনীতির মধ্যে নিজস্ব ভারসাম্য খুঁজেছে। তবে একবিংশ শতকে বৈশ্বিক ক্ষমতার অক্ষ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিসরে 'গ্লোবাল সাউথ' ও বহুমেরু ভিত্তিক ক্ষমতা-কেন্দ্রের উত্থান সুস্পষ্ট হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পারস্পরিক সম্পর্ক বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের অন্যতম নির্ধারক উপাদান। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্বের রাজনীতিতে একক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলেও, দ্রুত চীন ও রাশিয়ার পুনরুত্থান সেই একাধিপত্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। ভারত তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও কূটনৈতিক সক্রিয়তার কারণে এখন একটি অনিবার্যশক্তি। এই চার শক্তির সম্পর্ক শুধু বৈশ্বিক রাজনীতির গতিপথকেই প্রভাবিত করছেনা, বরং দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশের নীতিও ভবিষ্যতকে গভীরভাবে আকার দিচ্ছে। ভারত-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা, ভারত-রাশিয়ার ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক, চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সব মিলিয়ে একটি জটিল কূটনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে— ভারত কারও অনুসারী নয়, বরং একটি "লিডিং পাওয়ার"। জাতীয় স্বার্থই সর্বাগ্রে, আর সেই স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত প্রয়োজনে একদিকে পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করবে, অন্যদিকে বহুপাক্ষিক মঞ্চে বিকল্প শক্তির নেতৃত্ব দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্পের খামখেয়ালি ও ডিপ স্টেট-এর ভূমিকা

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ভারতের বৈদেশিক কূটনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে, গত তিন দশক ধরে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর, এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত সমন্বয়—সবই এই সম্পর্ককে গভীরতর করেছে। কোয়াড (Quad) ফ্রেমওয়ার্কে ভারত-মার্কিন সমন্বয় চিনের প্রভাব প্রতিহত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রায়শই অনির্দেশ্য। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনকালে একদিকে প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যে সহযোগিতা বাড়লেও, অন্যদিকে শুল্ক, ভিসা নীতিও জ্বালানি আমদানিতে চাপ ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। মোদী সরকার এখানে দৃঢ় ও কূটনৈতিকভাবে সংযত অবস্থান নেয়। ভারতের রাশিয়া-নির্ভর জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের আপত্তিসত্ত্বেও নয়াদিল্লি নিজস্ব সিদ্ধান্ত বজায় রাখে। স্পষ্টত, ভারত বন্ধুত্ব বজায় রাখলেও জাতীয় স্বার্থে কোনো আপস করতে রাজি নয়। তবে শুধু ট্রাম্পের

খামখেয়ালি নীতি নয়, মার্কিন ডিপ স্টেট দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে দীর্ঘদিন সক্রিয়। বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন চাপ, নেপালের সাংবিধানিক পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ, কিংবা পাকিস্তানের ক্ষমতার ভারসাম্যে সূক্ষ্ম ভূমিকা—এসবই দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার অদৃশ্য হাতের প্রমাণ। ভারতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটি কেবল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বরং ভারতের কৌশলগত প্রভাবকেও সীমিত করার অপপ্রচেষ্টা। মোদীর নেতৃত্বে ভারত এসব হস্তক্ষেপকে মোকাবিলা করছে—ঢাকা ও কাঠমান্ডুর সঙ্গে সমঝোতা বজায় রেখেও নিজের ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকার অটুট রেখেছে।

রাশিয়া ও চিন: স্বার্থের ভারসাম্য

ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও গভীর। প্রতিরক্ষা ক্রয়, পারমাণবিক সহযোগিতা ও জ্বালানি অংশীদারিত্বে মস্কো ভারতের অপরিহার্য অংশীদার। সোভিয়েত যুগ থেকে চলে আসা এই সম্পর্ক আজও কার্যকর। তবে, ইউক্রেন যুদ্ধ ও তার পরবর্তী বৈশ্বিক মেরুকরণের ফলে রাশিয়ার অবস্থান দুর্বল হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেএবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেও ভারত রাশিয়া থেকে সুলভে তেল আমদানি করে, যা একদিকে ভারতের অর্থনীতি স্থিতিশীল করেছে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক অটুট রেখেছে। এই অবস্থান ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতিফলন। ভারত বুঝতে পারছে যে, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করা তার দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের পরিপন্থী। তাই রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভারত বহুমুখী কূটনীতির পথ অনুসরণ করছে।

ভারত–চিন সম্পর্ক সবসময় দ্বৈত প্রকৃতির। একদিকে দুই দেশ বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে বাণিজ্যে জড়িত; অন্যদিকে সীমান্ত সংঘাত, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ও ভূরাজনৈতিক সন্দেহ তাদের সম্পর্ককে

সংঘাতপূর্ণ করে তোলে। গালওয়ান সংঘর্ষ এই দ্বন্দ্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।বাণিজ্যিক নির্ভরতা একদিকে বেড়েছে, অন্যদিকে সীমান্তে সংঘর্ষ ভারতকে সতর্ককরেছে। লাদাখ সংঘাত প্রমাণ করেছে যে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক কখনোই একমুখী হতে পারেনা। মোদী সরকার সামরিক প্রতিরোধে দৃঢ় থেকেছে, আবার কূটনৈতিক আলোচনাতেও অংশ নিয়েছে। ফলে ভারতের অবস্থান হয়েছে দ্ব্যর্থহীন—চিনের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব, তবে সার্বভৌম স্বার্থে কোনো ছাড় নেই। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের ঘনিষ্ঠতা, শ্রীলঙ্কায় বন্দর প্রকল্প, নেপাল ও বাংলাদেশে বিনিয়োগ—সবই ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ফলে ভারত চিনের মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সঙ্গে কৌশলগত জোটকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

BRICS: বিকল্প আন্তর্জাতিক কাঠামোতে ভারতের নেতৃত্ব

ভারত ব্রিকস মঞ্চকে তার জাতীয় স্বার্থসাধনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে BRICS ভারতের কূটনৈতিক বিকল্প ও ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা প্রাধান্যের বিকল্প হিসেবে BRICS ভারতের জন্য এক নতুন মঞ্চ। এখানে ভারত শুধু সদস্য রাষ্ট্র নয়, বরং Global South–এর কণ্ঠস্বর। BRICS ব্যাংক (NDB), বাণিজ্যে স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার, এবং (BRICS+) ব্রিকস গ্রুপের প্রসারে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা প্রমাণ করে যে মোদি বহুপাক্ষিক পরিসরে নতুন শক্তি ভারসাম্য গড়তে আগ্রহী। BRICS-এ ভারতের কৌশল মূলত দুটি স্তরে কাজ করছে। প্রথম, উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে ভারতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা নির্ভরতার বাইরে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করা। BRICS একটি বহুমাত্রিক প্ল্যাটফর্ম যেখানে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত। এই মঞ্চ ভারতের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি পশ্চিমা শক্তির বাইরে একটি বৈশ্বিক ফোরাম, যেখানে ভারত নিজের বক্তব্য ও স্বার্থকে তুলে ধরতে পারে।

একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভারতের অর্থনীতিও প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা এবং চিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা—সবই ভারতের জন্য জটিল সমীকরণ তৈরি করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য ও ভূরাজনৈতিক ইস্যুতে দ্বন্দ্ব ভারতের কাছে যুক্তরাষ্ট্র নির্ভরতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করেছে। এই পরিস্থিতিতে BRICS ভারতের জন্য একটি বিকল্প মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে ভারত উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করছে। সন্ত্রাসবিরোধী সংগ্রাম, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মতো ইস্যুগুলোয় ভারত BRICS-এ সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে ভারত একদিকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করছে, অন্যদিকে নিজের কৌশলগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও ভারত BRICS-এর কাঠামোর মধ্যে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছে। এটি দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরতার ক্ষেত্র তৈরি করছে। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেও BRICS একটি কৌশলগত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনও অস্থায়ী সংকট ভারতে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারছেনা, কারণ BRICS ভারতের কাছে এক ধরনের 'ভারসাম্যের প্ল্যাটফর্ম'। ভারত BRICS-এর মাধ্যমে বহুধ্রুবীয় বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চাইছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকলেও ভারত এই মঞ্চ ব্যবহার করে রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক সক্রিয় রাখছে এবং গ্লোবাল সাউথ-এর নেতৃত্ব দাবি করছে। এভাবে ভারত একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখছে, অন্যদিকে BRICS-এর মাধ্যমে বিকল্প কূটনৈতিক পথ গড়ে তুলে জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতিমূলত জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক এবং সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের খামখেয়ালিনীতিও Deep State–এর হস্তক্ষেপ, রাশিয়া–চিনের জটিলতা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ—সব কিছুর মধ্যেও ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। অপরেশন সিঁদুর তার প্রতীক—ভারত আজ কেবল প্রতিরক্ষামূলক রাষ্ট্র নয়, বরং সক্রিয় শক্তি, যে নিজের সীমান্ত, স্বার্থও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই নীতি কেবল কূটনৈতিক সাফল্য নয়; এটি ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণ ও ভবিষ্যতের বৈশ্বিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি। আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতকে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হচ্ছে চিনের প্রতিরোধে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ধরে রাখতে হচ্ছে কৌশলগত ভারসাম্যের জন্য। এই অবস্থায় ভারতের ভূমিকা একধরনের ব্যালান্সার বা ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর নির্ভর করতে চায় চিনকে প্রতিরোধ করার জন্য, রাশিয়া ভারতকে প্রয়োজন তার ঐতিহাসিক বন্ধু ও এশিয়ার বাজার হিসেবে। আবার, চিন ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এড়াতে পারছেনা। ভারত নিজেকেএমন এক অবস্থানে রাখতে চাইছে, যেখানে সব শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু কোনোটির সঙ্গেই একচেটিয়া নির্ভরশীলতা তৈরি হবেনা।

ভারত–মার্কিন–রাশিয়া–চিনসম্পর্কএক বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রীয় অক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা, এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য এই সমীকরণের উপর নির্ভরশীল। অতএব বলা যায়, ভারতের অগ্রাধিকার হল কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা। মার্কিন ঘনিষ্ঠতা, রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা—সব কিছুর মধ্যেই ভারতকে তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ভারত এই বহুমুখী কূটনীতিতেই দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক উভয় অঞ্চলে তার নেতৃত্বকে সুসংহত করে চলেছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যতই প্রবল হোক না কেন, এই সমীকরণের মূল ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে ভারত নিজেকে প্রমাণ করেছে।

২০৩৮ সালেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে ভারত

- আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে ভারত, জানাচ্ছে সাম্প্রতিক সমীক্ষা
- বহুজাতিক সংস্থা আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর Economic Watch এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে এই পূর্বাভাস
- ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে ওঠা কেবল সময়ের অপেক্ষা

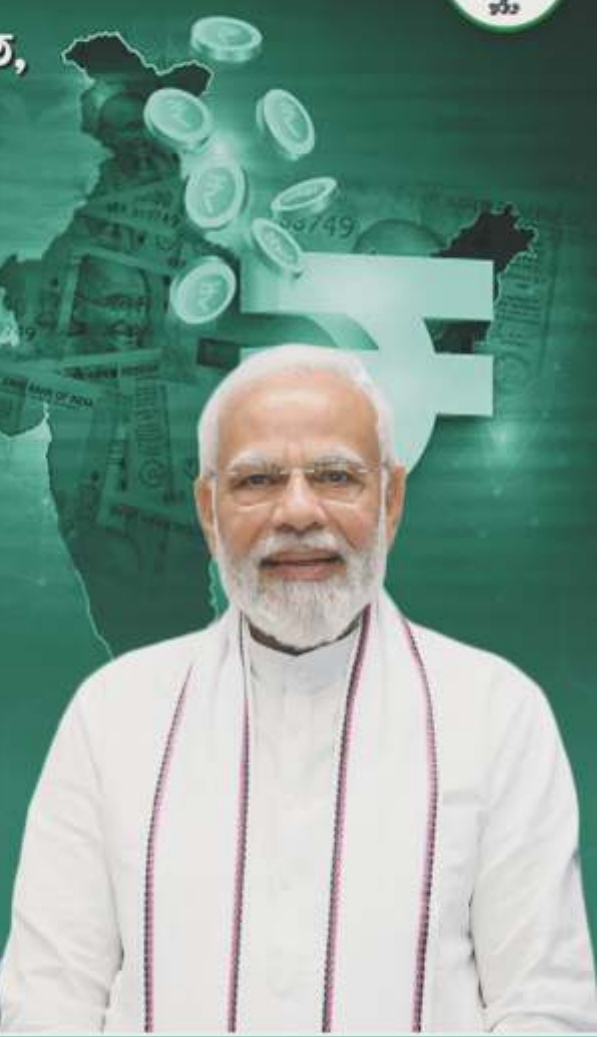

মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমেরিকাকে ছাপিয়ে যাবে ভারত

/BJP4Bengal bjpbengal.org

বেঙ্গল ফাইলস

বাঙালি হিন্দুর কালেকটিভ শক থেরাপি

সৌভিক দত্ত

এই সিনেমা একটা বজ্রপাত, যার আলোর ঝলকানি আমাদের দেখিয়ে দেয় সেই দিন কলকাতায় যে রক্ত ঝরেছিল সেই রক্ত আজও শুকায়নি, এখনও শুকায়নি। প্রশাসন তখনও হিন্দুদের পক্ষে ছিল না, এখনও নেই। তখনও আমাদের নিজেদের লড়াই নিজেদের লড়তে হয়েছিল গোপাল মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে, আর এখনও সেটাই হচ্ছে। সেদিন ছিল কলকাতা আজ হয়েছে মুর্শিদাবাদ-দেগঙ্গা-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ। সেদিন ছিল জিন্নাহ-গোলাম সারওয়ার-সোহরাওয়ার্দী আর আজ আছে ...না থাকগে, সবাই জানে।

কেউ কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল শুধুমাত্র একটা সিনেমা দেখার জন্য বাঙালিকে লম্বা জার্নি করে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে হবে? আমরা এখন বিভিন্ন কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই। উন্নত মানের পড়াশোনা করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অন্য রাজ্যে যায়, হাতে কাজ নেই বলে আমরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্য রাজ্যে যাই, ধর্মীয় অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াটা তো আমাদের একরকম ঐতিহ্য হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু তাই বলে সিনেমা দেখার জন্য অন্য রাজ্যে যাওয়া? হ্যাঁ অবশেষে অন্যদের মতো আমাকেও সেটাই করতে হলো। প্রযত্নে বেঙ্গল ফাইলস এবং অবশ্যই প্রযত্নে মাননীয়ার শাসন।

এটা কিন্তু আসলেই অদ্ভুত। ১৯৪৬ এর হিন্দু গণহত্যা করলো কারা? মুসলিম লিগ। সুদীর্ঘ এত বছর ধরে সেই ঘটনা চেপে রাখলো আর ভুল ন্যারেটিভ ছড়ালো কারা? কমিউনিস্টরা। কিন্তু এই দুই দলের কেউই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নিয়ে তৈরি সিনেমা পশ্চিমবঙ্গের কোনো হল মালিক দেখানোর সাহসটুকুও করে উঠতে পারে না। কেন? তাহলে কি রসুনের সব কোয়ার গোঁড়া একই জায়গায় নাকি? আমাদের ভাবা প্রয়োজন। আজ যদি বাঙালির একটা সিনেমা দেখানোর স্বাধীনতাও না থাকে, তাহলে আগামীকাল আমাদের বাঁচার স্বাধীনতাও থাকবে কিনা তার নিশ্চয়তা কে দেবে? ১৯৪৬ সালে আমাদের পূর্বপুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল

আমরা কি শুধুই জ্বলে পুড়ে মরবো?

অস্ত্র দিয়ে আর এই ২০২৫ সালে আমাদের স্মৃতিকে হত্যা করা হচ্ছে সন্ত্রাসের সেন্সর দিয়ে।

অনেক পরিকল্পনা ছিল ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোতে সিনেমাটি দেখার। কিন্তু সেতো ভাগ্যে জুটলোই না। অবশ্য যেদিন ট্রেলার রিলিজের দিন ঝামেলা করা হলো সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এই সিনেমা পশ্চিমবঙ্গ চলতে দেওয়া হবে না। তবে ভেবেছিলাম হয়তো দু একদিন চলার পরে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সন্ত্রাসের শিকড় যে এতদূর পৌঁছে গেছে আর হল মালিকরা সিনেমাটি একবারও দেখাতে সাহস করবে না সেটা সত্যিই আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। অগত্যা রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠে, লোকাল ট্রেনে হাওড়া পর্যন্ত গিয়ে ভোর ৬:১৫ এর ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে সকাল ১১:৩০ এ গিয়ে পৌঁছলাম ধানবাদে। এবং আমি একা নই, সে ট্রেনের একটা বড় অংশই ছিল ধানবাদের সিনেমা দেখতে যাওয়া পর্যটক। মনে হচ্ছিল ফিল্ম ট্যুরিজম নামে একটি পর্যটন ব্যবসায়ই খুলে গেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে। সৌজন্যে আমাদের রাজ্যের বাক স্বাধীনতা।

অথচ একটা অদ্ভুত বিষয় হল, বর্তমান ভারতে যে তথাকথিত 'হিন্দু সম্প্রদায়িকতা'-র বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বেশ কিছু তথাকথিত সেকুলার দল মুখিয়ে আছে, সেই তথাকথিত 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা'-র বিরুদ্ধে ভারত জুড়ে অজস্র সিনেমা-সিরিয়াল-নাটক-থিয়েটার এবং তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র গুজরাট দাঙ্গা নিয়েই কাই পো চে, পারাযানিয়া, ফাইনাল সল্যুশন, ফিরাক, দা সবরমতি রিপোর্ট, চাঁদ বুঝ গয়া, ভিলাপাঙ্গালক্কাপ্পুরাম, দেব, Accident or Conspiracy ইত্যাদি ইত্যাদি সিনেমা হয়েছে। সরাসরি টার্গেট করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। কিন্তু সারা ভারত তো অনেক দূরের কথা, গুজরাট রাজ্যেও সিনেমাগুলো কোনদিনও চলতে বাঁধা পায়নি। ছবিগুলি গুজরাটে সেই সময়ে চলেছে যখন নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী I পরে প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও চলেছে I আহমেদাবাদের প্রতিটি মাল্টিপ্লেক্স-এ চলেছে। আসলে এটাকেই বলে গণতন্ত্র, এটাকে বলে সভ্যতা, civilisation। আমি তোমার মতকে সমর্থন করি না, কিন্তু আমি তোমার মত প্রকাশের অধিকারকে চিরকাল রক্ষা করে যাব। যেটা বিজেপি করেছে, নরেন্দ্র মোদী করেছে, তথাকথিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা করেছে। আর দেশটাকে এখনো গুজরাট না বানাতে দেওয়ার ঠেকা নিয়ে বসে থাকা নচিকেতার রাজ্যে বেঙ্গল ফাইলস একবারের জন্যও চলল না। কি দারুণ না?

বেঙ্গল ফাইলস বিষয়ে তো নতুন করে কিছু বলারই নেই। বাংলা বা ভারত তো অনেক কম কথা, যতদিন মানুষের সভ্যতা থাকবে ততদিন পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে এই সিনেমাটি একটি মাইল ফলক হয়ে থেকে যাবে। কারণ এটি বাঙালি হিন্দুর গণহত্যা নিয়ে তৈরি প্রথম সিনেমা। এর আগে তৈরি কোনো সিনেমা বা সিরিয়ালের সাহস হয়নি এই অভিনয় দুনিয়ার বাম-ইসলামিক বাস্তুতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে এটা দেখানোর যে কাদের হাতে বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়েছিল। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এবং আমাদের অপদার্থতা যে আজ পর্যন্ত আমাদের গণহত্যা নিয়ে একটাও সিনেমা হয়নি। এই আর্টিকেল লেখার জন্য আমি একটু ইন্টারনেট সার্চ করছিলাম পৃথিবীর কোন কোন জাতির গণহত্যা নিয়ে সিনেমা হয়েছে সেটা দেখার জন্য। ইহুদী থেকে শুরু করে আর্মেনীয় হয়ে কম্বোডিয়া-বসনিয়া-রুয়ান্ডা-নেটিভ আমেরিকান সহ অনেক লম্বা একটা লিস্ট পেলাম। কিন্তু সেই লিস্টে আমার জাতির নাম নেই। কারণ আমার জাতিতে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও অভিনেতা-পরিচালক ইত্যাদি জন্মালেও তাদের কারো সাহসে কুলায়নি নিজের জাতির গণহত্যা বিষয়ক কোনো সিনেমা বা নিদেনপক্ষে ডকুমেন্টারি বানানোর। আফশোষ।

শ্রদ্ধেয় শ্রী গোপাল মুখার্জি মহাশয়।

আর সেটাই করে দেখালেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। আমি কোনো বাঙালি অবাঙালি ভেদাভেদ না করেও এটা বলতে পারি যে, ১৯৪৬ সালে হওয়া বাঙালি হিন্দু গণহত্যাকে যদি সুদীর্ঘ ৭৯ টা বছর পরে পর্দায় উঠতে হয় একজন অবাঙালি

পরিচালকের হাত ধরে - তাহলে আমাদের আর বাঙালি অস্মিতা নিয়ে গর্ব করা মানায় না - নেতাজি সুভাষ এর উত্তরাধিকার দাবি করা মানায় না। এটা আমাদের লজ্জা।

সিনেমার গল্পের বিষয়ে কিছু বলবো না। কারণ আমি চাই যারা এখনো দেখেননি তাদের উৎসাহ এবং কৌতুহলটা বজায় থাকুক। কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই OTT তে চলে আসবে। সবাই দেখতে পারবেন। তবে এইটুকু বলতে পারি যে সিনেমাটি আপনাকে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেবে না। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘন্টা আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে সিনেমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ডায়লগ এমনকি প্রতিটি গান পর্যন্ত। বাংলায় একটা প্রচলিত বাক্য আছে, অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর - সিনেমা হলটাতে সবাই যেন এই পাথর হয়েই বসেছিল পুরো সময়টা। হলে বসে মনে হচ্ছিল এইটা কোনো সিনেমা না, এটা যেন একটা শক থেরাপি দেওয়া হচ্ছিল আমাদের। দর্শকদের আত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল এর বিভিন্ন দৃশ্যগুলি।

প্রত্যেকটি মানুষকে এই সিনেমা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে দেখো তোমার পূর্বপুরুষের সাথে এমন নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল কিন্তু ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদরা তোমাদের সেই ঘটনা জানতে দেয়নি। এই সিনেমা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আমাদের প্রোপাগান্ডা নির্ভর ইতিহাস শিক্ষা নিয়ে, সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদদের নিয়ে এমনকি রাস্তায় দেখলে সাইকেল থেকে নেমে প্রণাম করা আমাদের শিক্ষকদের নিয়েও যারা কিনা কখনোই একবারের জন্য আমাদের এই ঘটনা জানায়নি। এই সিনেমা একটা বজ্রপাত, যার আলোর ঝলকানি আমাদের দেখিয়ে দেয় সেই দিন কলকাতায় যে রক্ত ঝরেছিল সেই রক্ত আজও শুকায়নি, এখনও শুকায়নি। প্রশাসন তখনও হিন্দুদের পক্ষে ছিল না এখনও নেই। তখনও আমাদের নিজেদের লড়াই নিজেদের লড়তে হয়েছিল গোপাল মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে, আর এখনও সেটাই হচ্ছে। সেদিন ছিল কলকাতা আজ হয়েছে মুর্শিদাবাদ-দেগঙ্গা-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ। সেদিন ছিল জিন্নাহ-গোলাম সারওয়ার-সোহরাওয়ার্দী আর আজ আছে..... না থাকগে, সবাই জানে।

ছবির কুশীলবরা।

১৯৪৬ সাল আর বর্তমান সময় - এই দুটি সময়ের কথা সমান্তরালে চলেছে এই সিনেমাতে। অতীত ও বর্তমানকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে ভারতী ব্যানার্জির চরিত্র, যেটি অসাধারণ অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন পল্লবী জোশি। অভিনেতা অভিনেত্রীরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় যথাযথ। মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, রাজেশ খেরা, পল্লবী জোশী, সিমরত কৌর, শাশ্বত চ্যাটার্জি, নমাশি চক্রবর্তী সহ সবাই নিজেদের সেটা প্রচেষ্টটুকু দিয়ে দিয়েছেন। আর গোপাল মুখোপাধ্যায় এর চরিত্রে সৌরভ দাসের কথা তো বলাই বাহুল্য। জহুরীর চোখ আছে বিবেক অগ্নিহোত্রীর। পর্দায় যেন একেবারে গোপাল মুখোপাধ্যায়কেই সরাসরি নামিয়ে এনেছিলেন সৌরভ। সৌরভ যদি এরপর অভিনয়ে সর্বভারতীয় অফার পেতে না শুরু করে তাহলে সেটাই অস্বাভাবিক হবে। গান্ধী চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েনও সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন অনুপম খের। দর্শন কুমারের কৃষ্ণ পণ্ডিতের মনোলগগুলি আমাদের মাথার মধ্যে গিয়ে আঘাত করবে। এবং সবথেকে বড় চমক আছে সবার শেষে। সিনেমার শেষে আমরা বুঝতে পারি ভারতী ব্যানার্জি আসলে প্রতীকী ভারতমাতা, যিনি বারবার হিংসা, বিভাজন ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হচ্ছেন।

বেশি কিছু বলার নেই। অপেক্ষা করুন। ওটিটি তে আসলে অবশ্যই দেখুন। অন্যদেরও দেখান। পারলে এলাকায় এলাকায় ক্যাম্প করে সিনেমাটা দেখান। মানুষের মাথার ভেতর পর্যন্ত ঢুকে আত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই সিনেমা। কিছু সিনেমা আছে যেগুলো মানুষকে ভাবায়, আঘাত করে, জাগিয়ে তোলে। এটা সেই ধরনেরই সিনেমা।

এই সিনেমা বাঙালি হিন্দু বালিতে মুখ গুঁজে রেখে নিরাপদ থাকতে চাওয়ার নির্বুদ্ধিতাকে ভেঙে দেয় আঘাত করে। সেই আঘাত আমাদের অস্বস্তিতে ফেলবে। কিন্তু সেই অস্বস্তি জরুরী। কারণ সেটাই আমাদের বুঝিয়ে দেবে ইতিহাসে কোন ভুল আমরা করেছিলাম এবং কোন ভুল আমরা এখনো করে চলেছি। কাদের ভরসা করা যায় এবং তাদের ভরসা করা যায় না। কারা আমাদের আপন এবং কারা নয়।

পরিশেষে একটা কথা বলি। শুধু এই সিনেমা প্রসঙ্গে নয়, আমাদের ইতিহাস ও বর্তমানের নানা সংবাদ সংক্রান্ত সব ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। যদি কোনো সম্প্রীতি বা সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সত্যিকে জোর করে ধামাচাপা দিতে হয়, তবে সেই সম্প্রীতি বা সম্পর্ক কোনদিন আসলে ছিলোই না। সেটা ছিল একটি দাসত্ব মাত্র, যেখানে আঘাত পেলেও মুখ ফুটে সেই আঘাতের কথা বলা যায় না। সত্যিকে গ্রহণ করার পরেও যে সম্প্রীতি বজায় থাকে সেটাই আসল সম্প্রীতি। যেমন হলোকাস্ট নিয়ে অসংখ্য সিনেমা হওয়ার পরেও জার্মানরা ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, জার্মানি ইহুদী দাঙ্গা হয়না। কারণ সেখানে বর্তমানে প্রকৃত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আজ যদি শুধুমাত্র একটা বেঙ্গল ফাইলসের জন্য তথাকথিত সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে। আর কাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে সেটা আপনি অবশ্যই জানেন। তাইনা?

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন-কে অভিনন্দন জানাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন-কে অভিনন্দন জানাতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ।

একেবারে শেষ সারিতে বসে একজন আম বিজেপি সাংসদের মতো নয়াদিল্লিতে দলের 'সংসদ কার্যশালা' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে বন্যায় বিপর্যস্ত পরিবার এবং কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মাধ্যমে পাঞ্জাবে কৃষকদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার।

হিমাচল প্রদেশে বন্যা ও ধ্বস্নে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলার পর রাজ্যের সহায়তায় দেড় হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত এবং সিঙ্গাপুরের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজুবত এবং বহুমুখী সহযোগিতার পথকে আরও প্রশস্ত করতে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং।

GST হারে হ্রাস

সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি

সামগ্রী	আগের GST	নতুন GST
মাখন, ঘি, চিজ	12%	5%
বাসনপত্র, ফিডিং বোতল	12%	5%
স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা	18%	0%
সেলাই মেশিন ও যন্ত্রাংশ	12%	5%
থার্মোমিটার	18%	5%
মেডিকেল অক্সিজেন, টেস্ট স্ট্রিপ, গ্লুকোমিটার, ডায়াগনস্টিক কিট	12%	5%
মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব, পেন্সিল, শার্পনার, ক্রেয়ন	12%	0%
ট্রাক্টর	12%	5%
এসি (Air Conditioners)	28%	18%
টেলিভিশন	28%	18%
ডিশ ওয়াশিং মেশিন	28%	18%

মধ্যবিত্তের মুখে হাসি ফোটানই মোদীজির মূল লক্ষ্য

ধন্যবাদ মোদীজি

/BJP4Bengal bjpbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

বিজেপি

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।